তাওবাতান নাসূহা

খাঁটি তওবা

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

মূল

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী

প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম

দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

তাওবাতান নাসূহা
খাঁটি তওবা

মূল

ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী

প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশিদ

প্রকাশনা

৬২ [বাষট্টি]

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৮

প্রকাশক

হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ

শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস

২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

আমার ছাত্র আনাস দেওয়ান
হৃদয়ের মণিকোঠায় আজন্ম লালিত স্বপ্ন
বাস্তব হল যার কারণে;
তার পরিবারের মরহুম সকল সদস্যের রূহের মাগফিরাত
ও জান্নাতে উঁচু মাকাম প্রত্যাশায়,
জীবিত সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ ও নেক হায়াত কামনায়...
–মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশনা প্রসঙ্গ

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী একজন কথাশিল্পী। সেই কথা লেখ্য হোক, অথবা কথ্য– কোথাও জুড়ি নেই তাঁর। পূরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর আবেদন। প্রথমত আরবীতে। তারপর ইংরেজীতে, উর্দুতে, ফারসীতে, মালয়তে, বাংলাতে...।

বাংলায় আমরা এ পর্যন্ত তাঁর যতগুলো গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ডজন ছুই ছুই করছে। এখন হাতে তুলে দিচ্ছি তাঁর একটি নতুন গ্রন্থ। মূল আরবী নাম 'যিকরায়াতু তা–ইবিন' । বাংলায় নাম দিলাম, 'তাওবাতান নাসূহা : খাঁটি তাওবা '।

ড. আরিফী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। আবার জুমার খতীব। দীনের দাওয়াত ও দীনী বিষয়ে বক্তৃতা তাঁর মৌলিক পেশা। বিশ্বের আনাচে–কানাচে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা বিষয়ভিত্তিক। তাঁর বক্তৃতার অডিও, ভিডিও এবং ওয়ার্ড–পিডিএফ ইন্টারনেটে একসাথে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয় সেগুলো।

গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদের আস্থাভাজন আলেমে দীন, লেখক, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী মামুনুর রশীদ। আর এর অঙ্গসজ্জার যাবতীয় কাজ করেছেন হুদহুদ প্রকাশনের পরিচালক, তরুণ আলেমে দীন মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন। দু'জনকেই আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের অনেক বিষয় শিখতে এই বইটি সাহায্য করবে। এজন্য আমরা বলব, বইটি আপনি পড়ুন। বার বার পড়ুন। আরেক জনকে পড়তে দিন। আপনার দেওয়া একটি ধর্মীয় বই যদি কারও জীবনে সামান্য পরিবর্তন এনে দেয়, তা হলে আপনি অনেক সওয়াবের অধিকারী হবেন। যার বিনিময় হবে জান্নাত।

আল্লাহ আমাদের মেহনত কবুল করুন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা
০২/০৮/২০১৮

তাওবাকারীর স্মৃতিচারণ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি গুনাহ ক্ষমাকারী এবং তাওবা কবুলকারী; যিনি কঠোর শাস্তিদাতা ও প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি কোনো কিছুর জন্য বলেন 'হয়ে যাও' আর তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর অপার দয়া ও অনুগ্রহেই মুসা عليه السلام ও তাঁর সম্প্রদায় রক্ষা পেয়েছিলেন ফেরাউন ও তার বাহিনীর হাত থেকে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি ছিলেন নূহ عليه السلام-র আহ্বানে সর্বোত্তম সাড়াদানকারী, যখন তিনি তাঁকে আহবান করেছিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর ইউসুফ عليه السلام-কে তিনিই ইয়াকুব عليه السلام-র কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করি– এক আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক বা সমকক্ষ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করি– মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হামদ ও সালাতের পর!

– এটি একটি স্মৃতি-স্মারক।

– কাগজের বুকে অনুভব-অনুভূতির কোমল আঁচড়।

– স্মৃতির রোমন্থন।

– হাঁ, এটি তাওবাকারীর স্মৃতিচারণ।

– গুনাহগারের চোখে মাগফিরাতের আলো প্রজ্বালন।

– এটি স্মারক ওই ব্যক্তির জন্য, যে বিশ্বাস করে–

﴿نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

[হে নবী!] আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা হিজর : ৪৯]

যেমনিভাবে বিশ্বাস করে–

﴿وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ﴾

আমার শাস্তি– সে অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি। [সূরা হিজর : ৫০]

এতে বর্ণিত হয়েছে তাদের কথা, যাদের ব্যাপারে তাদের রব সংবাদ দিয়েছেন– 'তাওবাকারীদের প্রতি তিনি খুশি হন।' অথচ তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে তারা তাঁর প্রতি পুরোপুরিই মুখাপেক্ষী।

কেনই বা তিনি তাদের তাওবায় খুশি হবেন না, তিনি যে তাদের এই বলে ডেকেছেন–

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিন-রাত গুনাহ করছো, আর আমি তোমাদের যাবতীয় গুনাহের ক্ষমাকারী। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিব। [সহিহ মুসলিম : ৬৭৩৭]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা যুমার : ৫৩]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

নিশ্চয়ই তিনি মহা ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। [সূরা বাকারা : ৩৭]

তাদের নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন তাদের ডেকে বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

আল্লাহ ﷻ রাতের বেলায় স্বীয় হাত বাড়িয়ে দেন, যেন দিনের অপরাধী তাঁর কাছে তাওবা করে। এমনিভাবে দিনের বেলায় স্বীয় হাত বাড়িয়ে দেন, যেন রাতের অপরাধী তাঁর কাছে তাওবা করে। এভাবে প্রতিদিন চলতে থাকবে, যতদিন না পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্য উদিত হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৬৫]

বান্দার তাওবায় আল্লাহ ﷻ খুশি হন। তাওবা– কৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।

এক তাওবাকারীর ঘটনা

মহিমান্বিত এক বৃদ্ধ। আমরা তাঁর মজলিসে বসছি, যখন তার বয়স বেড়ে গেছে এবং হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে। চোখের জ্যোতিও কমে এসেছে। তিনি আর কেউ নন। প্রিয় নবীজী ﷺ-র বিখ্যাত সাহাবী কা'ব ইবনে মালেক ﵁। তিনি নিজেই তাঁর যৌবনের স্মৃতিচারণ করছেন। আমাদের শোনাচ্ছেন তাবুক যুদ্ধ থেকে তাঁর বাদ পড়ে যাওয়ার কথা।

তাবুক যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-র জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। নবীজী ﷺ যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লোকজন যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করুক। লশকর তৈরি করার জন্য মানুষের কাছ থেকে তিনি চাঁদাও নিলেন। দেখতে দেখতে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী তৈরি হয়ে গেল।

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। সফরও ছিল অনেক দীর্ঘ। শত্রুপক্ষ শক্তিশালী ও গোঁয়ার। মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অনেক। তবে তাঁদের নাম কোনো নথিভুক্ত ছিল না।

কা'ব ﵁ বলেন, আমি তখন বেশ খোশহালেই ছিলাম। প্রস্তুত করেছিলাম দু'টি বাহন। জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলাম। এরপরও মৌসুমের প্রতি, ফসল পাকার প্রতি আমার অন্তরে ঝোঁক ছিল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন মনে মনে বললাম, আমি আগামীকাল বাজারে গিয়ে

জিহাদের কিছু আসবাব কিনব, তারপর গিয়ে তাঁদের সাথে মিলিত হব।

কথামতো পরদিন বাজারে গেলাম। একটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল এবং আমি বাড়ি ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল রওনা হব এবং তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। কিন্তু আবারও একটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল। আবারও মনে মনে বললাম, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল রওয়ানা হব। এভাবে চলে গেল কয়েক দিন। আমি ইসলামী লশকর থেকে পিছনে রয়ে গেলাম। তখন আমি বাজারে হাঁটতাম এবং মদীনায় ঘুরে বেড়াতাম। আমার নজরে পড়ত শুধু দুই ধরনের মানুষ– যাদের কপালে মুনাফিকি অবধারিত হয়ে গেছে অথবা আল্লাহ ﷻ যাদেরকে অপারগ সাব্যস্ত করেছেন।

কা'ব ﵁ মদীনায় রয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে চলে গেলেন। তিনি গিয়ে পৌঁছলেন তাবুকে। নজর বুলালেন সাহাবায়ে কেরামের চেহারার দিকে। দেখলেন, বাইআতে আকাবায় শরিক হওয়া একজন মানুষ তাদের মাঝে নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– কা'ব ইবনে মালেকের কী হয়েছে?

একজন জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার চাদর ও বাহুর উপর গৌরবের দৃষ্টি তাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

এ কথা শুনে হযরত মুআয ﵁ বললেন, কত খারাপ কথা আপনি বললেন! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যতদূর জানি, তিনি একজন ভালো মানুষ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।

কা'ব ﵁ বলেন, যখন নবীজী ﷺ তাবুক যুদ্ধ সম্পন্ন করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমি কীভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাব তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এ বিষয়ে আমি আমার পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে পরামর্শও নিলাম। তারপর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন, তখন আমার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল, সত্যের আশ্রয় না নিলে আমার রক্ষা নেই।

নবীজী ﷺ মদীনায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর উপবেশন করলেন মানুষের অজুহাত শোনার জন্য। তখন পেছনে থেকে যাওয়া লোকজন আসতে লাগল এবং ওজর পেশ করে করে কসম করতে লাগল। তারা সংখ্যায় ছিল আশির কিছু বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্য কৈফিয়ত মেনে নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করলেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ﷻ-র হাওলায় ছেড়ে দিলেন।

এক সময় কা'ব ইবনে মালেক رضي الله عنه এলেন নবীজীর কাছে। যখন তিনি সালাম দিলেন, তখন নবীজী তাঁর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মতো হাসলেন। কা'ব رضي الله عنه এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। যখন তিনি তাঁর সামনে গিয়ে বসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কেন পিছনে পড়েছিলে? তুমি না বাহন কিনেছিলে?

কা'ব رضي الله عنه বললেন, হাঁ অবশ্যই।

নবীজী ﷺ বললেন, তা হলে পিছনে পড়লে কেন?

কা'ব رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি দুনিয়ার অন্য কারও কাছে বসতাম, তা হলে আমি জানি আমি কোনো ওজর পেশ করে তার রোষ থেকে রক্ষা পেয়ে যেতাম। কারণ, আমার প্রতারণা করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি জানি, আজ যদি আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো মিথ্যা কথা বলি, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ ﷻ আপনাকে আমার উপর নাখোশ করে দিবেন; আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তা হলে আপনি আমার উপর নাখোশ হবেন ঠিক, কিন্তু আমি তাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোনো ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! এখন আমি যতটা শক্তিশালী এবং স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, আগে কখনও এমন ছিলাম না।

এতদূর বলে হযরত কা'ব رضي الله عنه থেমে গেলেন। নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে লোকটি— ইনি সত্য কথা

বলেছেন। আচ্ছা তুমি যাও, তোমার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ ফায়সালা করবেন।

কা'ব رضي الله عنه ধীর পদক্ষেপে উঠে চিন্তিত ও বিষণ্ন অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হলেন। তিনি জানেন না আল্লাহ ﷻ তাঁর ব্যাপারে কী ফায়সালা করবেন! তাঁর এই অবস্থা যখন তাঁর কওমের লোকজন দেখলেন, তখন কিছু লোক তার পিছু নিল। তারা তিরস্কার করে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! এর আগে আপনি কখনও কোনো অপরাধ করেছেন বলে আমরা জানি না। আপনি একজন কবি, কিন্তু তার পরও অন্যরা যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে ওজর পেশ করে গেল, তেমন ওজর পেশ করতে আপনি ব্যর্থ হলেন। আপনি কেন এমন কোনো ওজর তুলে ধরলেন না, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তারপর তিনি আপনার জন্য ইস্তিগফার করতেন এবং আল্লাহ ﷻ-ও আপনাকে ক্ষমা করে দিতেন।

কা'ব رضي الله عنه বলেন, এভাবে তারা আমাকে তিরস্কার করতে থাকল। এমনকি আমার কাছে মনে হল, আমি পুনরায় গিয়ে আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করে আসি। আমি তখন বললাম, আচ্ছা আমার মতো সমস্যায় কি আর কেউ পতিত হয়েছে?

লোকজন বলল, হাঁ, আরও দু'জন আপনার মতো কথাই বলেছেন এবং তাদেরকে আপনার মতোই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, তারা দু'জন কারা?

লোকজন বলল, মুরারা ইবনে রবী এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া।

তাঁরা দু'জন নেককার লোক। বদরে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ রয়েছে। এ কথা ভেবে আমি বললাম, আল্লাহর কসম। আমি কখনোই পুনরায় যাব না এবং আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করব না।

এরপর কা'ব رضي الله عنه-র দিনাতিপাত হতে থাকল একা; বিদীর্ণ হৃদয়ে। তিনি নিজের বাড়িতে বসে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নবীজী কা'ব

ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে লোকজনকে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

কা'ব رضي الله عنه বলেন, তখন লোকজন আমাদেরকে ছেড়ে দিল। তারা আমাদের জন্য হয়ে গেল অপরিচিতের মতো। আমি বাজারে যেতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হত যেন আমি তাদেরকে চিনিই না। বাগানগুলোও বদলে গেল। ওগুলোও যেন আমাদের পরিচিত নয়। পুরো দুনিয়াই আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। আমরা যেন নতুন কোনো দুনিয়াতে চলে এলাম।

আমার সঙ্গীদ্বয় তাঁদের বাড়িতে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের দিন-রাতের কাজই শুধু কান্না আর কান্না। তাঁরা কখনও মাথা উঁচু করতেন না। তাঁরা ইবাদত করতে লাগলেন পুরোহিতদের মতো। এই তিনজনের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে কম বয়সের এবং সবচেয়ে চঞ্চল। এজন্য আমি বাড়ি থেকে বের হতাম। মুসলমানদের সাথে জামাতে সালাত পড়তাম। বাজারে ঘুরে বেড়াতাম। তবে কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি এসে মসজিদে প্রবেশ করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিতাম আর লক্ষ করতাম তিনি কি সালামের জওয়াব দেওয়ার জন্য ঠোঁট নেড়েছেন, না তা-ও নাড়েননি। তারপর তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সালাত পড়তাম আর কানিচোখে তাঁর দিকে তাকাতাম। আমি যখন সালাতে মনোযোগ দিতাম, তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ করতেন। আর যখন আমি তাঁর দিকে লক্ষ করতাম, তখন তিনি অন্যদিকে মনোযোগ দিতেন।

এভাবেই গড়িয়ে যেতে লাগল কা'ব رضي الله عنه-র দিন-রাত। বেদনা আরও বেদনা জন্ম দেয়। তিনি তাঁর কওমের সুনামধন্য ব্যক্তি। তিনি একজন প্রাজ্ঞ কবি। তাঁকে চিনতেন রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাগণ। তাঁর কবিতা পৌঁছে গিয়েছিল আশপাশের শিক্ষিত সমাজে। তাঁদের সাধ ছিল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার।

আজ তিনি মদীনায় নিজের কওমের কাছে রয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁর সাথে কথা বলে না। তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। এভাবে যখন তাঁর

অসহায়ত্ব চরমে এবং সংকট চতুর্মুখী, তখন নেমে এল আরেক পরীক্ষা। তিনি একদিন বাজারে ঘুরছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল শাম থেকে আগত এক খ্রিস্টানকে। সে বলছে– আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের সন্ধান দিতে পারবে কে?

লোকজন ইশারা করে কা'ব رضي الله عنه-কে দেখিয়ে দিলেন। লোকটি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে গাসসানের সম্রাটের একটি পত্র তাঁর হাতে তুলে দিল। আজব ব্যাপার! গাসসান-সম্রাটের পত্র! তা হলে কি তাঁর সংবাদ শাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে! গাসসান-সম্রাটের কাছেও তাঁর গুরুত্ব আছে। আশ্চর্য! সম্রাটের উদ্দেশ্য কী? কা'ব رضي الله عنه চিঠিটি খুললেন। দেখলেন, তাতে লেখা আছে–

'পর সমাচার! হে কা'ব ইবনে মালেক! আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, আপনার নেতা আপনার উপর নিষ্ঠুর হয়েছেন এবং তিনি আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি ধ্বংস ও অপমানের দেশে থাকার জন্য সৃষ্ট হননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আমরা আপনাকে প্রবোধ দিব।'

চিঠি পড়া সম্পন্ন করে কা'ব رضي الله عنه বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! কুফরের লোকজন আমাকে প্রলোভন দিচ্ছে! এ তো আরেক বিপদ! চিঠিটি নিয়ে তিনি চুলার কাছে গেলেন। চুলা জ্বালিয়ে চিঠিখানা ভস্ম করে দিলেন। সম্রাটের প্রলোভনের দিকে কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

হাঁ, কা'ব رضي الله عنه-র জন্য খুলে গেছে সম্রাটদের দুয়ার। আমীর-উমারাদের প্রাসাদ তাঁকে সমাদর ও সম্মান করার জন্য আহ্বান করছে। অথচ চারপাশে মদীনা তাঁকে তিরস্কার করছে। সেখানকার লোকজন তাকে ভ্রুকুটি করছে। তিনি সালাম দিলে জওয়াব দেওয়া হয় না। তাঁর জিজ্ঞাসায় কোনো সাড়া দেওয়া হয় না। এরপরও তিনি কাফেরদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। শয়তান তাঁকে প্ররোচনা দিতে গিয়ে অথবা প্রবৃত্তির পূজারী বানাতে গিয়ে ব্যর্থ হল। সম্রাটের চিঠি তিনি আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন।

এভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল। পুরো হয়ে গেল একটি মাস। অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। বয়কটে তাঁর গলা শুকিয়ে গেল এবং আরও ঘনীভূত হতে লাগল। নবীজীও তাঁকে ডাকেন না, অহী-ও কোনো ফায়সালা দেয় না। যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল, তখন নবীজীর একজন দূত তাঁর কাছে এলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন দূত। হয়তো তিনি সংকট-হ্রাসের কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছেন– এই আশায় এগিয়ে গেলেন কা'ব ﵁। কিন্তু না, দূত বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রী থেকে দূরে সরে যেতে।

কা'ব ﵁ বললেন, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না এর মতলব অন্য কিছু?

দূত বললেন, না; তালাক দিতে হবে না। তবে তার থেকে দূরে থাকবেন এবং তার কাছে ঘেঁষবেন না।

কা'ব ﵁ স্ত্রীর কাছে গেলেন। বললেন, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং এই বিষয়ে কোনো ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকো। নবীজী কা'ব ﵁-র সঙ্গীদ্বয়ের কাছেও একই খবর পাঠালেন। তখন হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া অত্যন্ত দুর্বল একজন বুড়ো মানুষ। আপনি কি আমাকে তাঁর খেদমত করার অনুমতি দিবেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অনুমতি দিচ্ছি, তবে তিনি যেন তোমার কাছে না আসেন।

মহিলা বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর তো নড়বার শক্তিও নেই। এই ঘটনা ঘটার পর থেকে তিনি সব সময় বিষণ্ন থাকেন এবং রাত-দিন শুধু কাঁদেন।

দিনগুলো কা'ব ﵁-র জন্য আরও ভারী হয়ে উঠল এবং বয়কট হয়ে উঠল আরও অসহনীয়। এমনকি তিনি ঈমান নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা কেউই সাড়া দেন না; রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দেন, কিন্তু

কোনো জওয়াব শোনা যায় না। তা হলে তিনি এখন কোথায় যাবেন! কার কাছ থেকে পরামর্শ নিবেন!

কা'ব ﵁ বলেন, যখন আমার পরীক্ষা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আমি আমার চাচাতো ভাই আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। গিয়ে দেখি তিনি তার বাগানে রয়েছেন। আমি দেয়াল টপকে ভেতরে গেলাম। তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি হে আবু কাতাদা! আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?

তিনি চুপ থাকলেন। তখন আমি আবার বললাম, আবু কাতাদা! আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?

তিনি এবারও চুপ থাকলেন। আমি তখন আবারও তাঁকে বললাম, আবু কাতাদা! আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি?

তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

চাচাতো ভাই এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে এমন জওয়াব পেলেন কা'ব ﵁। তিনি জানেন না, এখন তিনি মুমিন কি না! তিনি এই জওয়াব সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুতে ভেসে গেল। তিনি আবার দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলেন। চলে গেলেন নিজ বাড়িতে। বসে গেলেন সেখানে। বাড়ির দেয়ালের দিকে নজর বুলাতে লাগলেন। বাড়িতে স্ত্রী নেই যে পাশে এসে বসবেন। কোনো আত্মীয় নেই যে প্রবোধ দিবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে তাঁদের সঙ্গো কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়ার পর এভাবে গত হয়ে গেল পঞ্চাশটি দিন।

পঞ্চাশ তম রাতের তৃতীয় প্রহরে নবীজী ﷺ-র উপর তাঁদের তাওবা কবুলের ঘোষণা নাযিল হল। নবীজী তখন উম্মে সালামা ﵂-র ঘরে

ছিলেন। তিনি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। তখন উম্মে সালামা ﵂ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কা'বকে সুসংবাদ পাঠাব না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে লোকজন তোমাদের উপর ভেঙে পড়বে। বাকি রাত আর ঘুমাতে পারবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করলেন, তখন লোকজনের মাঝে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা করলেন।

– লোকজন তাঁদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য চলে গেল।

কা'ব ﵁ বলেন, আমি বাড়ির ছাদে ফজরের সালাত পড়ে সে অবস্থায় বসে ছিলাম, যে অবস্থার কথা আল্লাহ ﷻ উল্লেখ করেছেন। নিজের উপর আমার ঘৃণাবোধ জন্মে গিয়েছিল। জমিনের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তা আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি চিন্তায় ভীষণভাবে আচ্ছন্ন ছিলাম যে, আমি মরে যাব কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জানাযা পড়াবেন না, অথবা তিনি মারা যাবেন কিন্তু আমি এই অবস্থায়ই থেকে যাব, কেউ আমার সাথে কথা বলবে না এবং আমার জানাযাও পড়া হবে না।

এমনই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম আমি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যা ভেসে আসছিল সালা পাহাড় থেকে। লোকটি বলছিলেন– হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

আমি তখনই সেজদায় পড়ে গেলাম। বুঝে নিলাম আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এসে পড়েছে। ইতোমধ্যে ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন একজন। আরেকজন পাহাড়ের চূড়া থেকে চিৎকার দিলেন। ঘোড়ার চেয়ে আওয়াজের গতি ছিল বেশি। তারপর যার কণ্ঠে আমি সুসংবাদ শুনেছিলাম, তিনি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছলেন, আমি গায়ের কাপড় দু'টি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলাম, সুসংবাদের পুরস্কারস্বরূপ। আল্লাহর কসম! আমার আর কোনো কাপড় ছিল না! কাজেই অপর দু'টি কাপড় ধার করে এনে পড়তে হল।

এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে ছুটলাম। দলে দলে লোকজন আমার সাথে দেখা করল এবং তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিল। তারা বলছিল, আপনার তাওবা কবুল হয়েছে এজন্য অভিনন্দন।

আমি গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের নিয়ে বসে আছেন। আমি আরও এগিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহর সামনে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তাঁর চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। যখন তিনি আনন্দিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা ঝলমল করত। মনে হত চাঁদের টুকরো।

যখন তিনি আমাকে দেখলেন, তখন বললেন, তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে?

তিনি বললেন, না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। তারপর তিনি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। আমি তাঁর সামনে বসলাম। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে আমার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রদান করে মুক্ত হতে চাই।

তিনি বললেন, না; নিজের জন্য কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটা তোমার জন্য ভালো হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে সত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন। আমি তাওবার অংশ হিসেবেই বাকি জীবনে কখনও সত্য ছাড়ব না।

হাঁ, আল্লাহ ﷻ কা'ব رضي الله عنه ও তাঁর সঙ্গীদের তাওবা কবুল করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গো ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুনাময়। এবং [তিনি ক্ষমা করলেন] অপর তিনজনকেও, যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল। [সূরা তাওবা : ১১৭-১১৮]

তাওবার পুরস্কার

আল্লাহ ﷻ তাওবাকারীদের প্রতি খুশি হন। খুশি হয়ে কেবল তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমাই করেন না, বরং তাদের যাবতীয় গুনাহ ও পাপসমূহকে নেকী ও পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ

يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ‎ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللهِ مَتَابًا﴾

...এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তাওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। [সূরা ফুরকান : ৬৮-৭১]

সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে–

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ.

হাকীম ইবনে হিযাম ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, আমি জাহেলী যুগে দান-খয়রাত, গোলাম আযাদ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যেসব নেক কাজ করেছি, তাতে কি আমি প্রতিদান পাব? হাকীম ইবনে হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি তোমার অতীতের সৎকর্মসহ ইসলাম গ্রহণ করেছ। অর্থাৎ তুমি যেসব নেকীর কাজ করেছ, তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২২০]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যাবতীয় গুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। তাওবার পর [ইসলাম গ্রহণের পর] জাহেলী যুগের [ইসলাম গ্রহণের পূর্বের]

যাবতীয় নেককাজের প্রতিদান দেওয়া হয়। তা হলে আর বাকি থাকল কী?! আর কী চাই?!

তাঁর দয়া ও দানের শেষ নেই

আল্লাহ মহান। তাঁর দয়া অফুরান। তাঁর দয়া ও দানের কোনো শেষ নেই; ক্ষমা ও মাগফিরাতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি তাওবা কবুলকারী। বান্দার তাওবা কবুল করেন। অনুতপ্ত বান্দাকে সাদরে বরণ করেন। তিনি দয়াময়, মেহেরবান। তাঁর রহমত সর্বব্যাপী; সবকিছুকে আচ্ছন্নকারী। তাঁর দয়া ও দুয়ার নেককার-বদকার সকলের জন্য উন্মুক্ত।

বান্দা গুনাহ করে ফেলার পর ফিরে এলে, তাওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটি হতে পারে, বান্দা গুনাহ করতেই পারে; তবে সমস্যা হচ্ছে গুনাহকে অভ্যাসে পরিণত করে নেওয়ায়। অতঃপর গুনাহ করতেই থাকা। তাওবা না করা।

– আল্লাহ রহমান, রহীম।

– বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

– তাঁর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে অগ্রগামী।

– তাঁর ক্ষমা তাঁর শাস্তির তুলনায় দ্রুতগামী।

– তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি তাদের পিতামাতার চেয়ে দয়াশীল।

সহীহাইনের বর্ণনায় এসেছে–

নবীজী ﷺ একবার এক যুদ্ধবন্দী নারীকে দেখিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি মনে কর এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানকে

আগুনে ফেলে দিতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ফেলার ক্ষমতা রাখলেও সে কখনোই ফেলবে না। নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন–

اَللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا.

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশি দয়ালু। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৫৪]

হাঁ, প্রিয় পাঠক!

আমাদের আল্লাহ ﷻ আমাদের প্রতি আমাদের পিতামাতার চাইতেও বেশি দয়ালু। তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও ক্ষমার বিশালতা লক্ষ করুন। তিনি সকলের জন্যই তাওবার দরজা খোলা রেখেছেন। কারও জন্যই বন্ধ নয়। এমনকি কাফের-মুশরিকদের জন্যও তাঁর দরজা বন্ধ নয়। যত বড় গুনাহগার ও পাপীই হোক না কেন, তাওবার দরজা তার জন্যও খোলা।

দেখুন সেই বৃদ্ধকে, যার বয়স অনেক হয়ে গেছে, বার্ধক্যে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে, হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি এসেছেন নবীজীর দরবারে। নবীজী ﷺ তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন। বৃদ্ধ অতি কষ্টে, পা টেনে টেনে, লাঠির উপর ভর করে এলেন। বয়সের ভারে তার ভ্রূযুগল চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন নবীজীর সামনে। অতঃপর বললেন –কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন, যে সব ধরনেই গুনাহই করেছে। কোনো গুনাহই বাদ রাখেনি। ছোট-বড় এমন কোনো গুনাহ নেই, যা সে করেনি। তার গুনাহগুলো যদি সমস্ত জমিনবাসীর মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে তা সকলকেই বরবাদ করে দিবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন ব্যক্তির জন্য কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে?

আগন্তুকের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন, অতিশয় বৃদ্ধ এক লোক। বয়সের ভারে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?

লোকটি জওয়াব দিলেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি নেক ও কল্যাণের কাজ করে যাও, গুনাহ পরিত্যাগ কর, আল্লাহ ﷻ তোমার সেসবকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।

বৃদ্ধ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার যত ধোঁকাবাজি, অন্যায়-অবিচার ও পাপাচার সবই?!

নবীজী বললেন, হ্যাঁ।

এ কথা শুনে বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন– আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার...। এভাবে চিৎকার করতে করতে আড়াল হয়ে গেলেন। [তবরানী, মুসনাদে বাযযার]

খাঁটি তাওবা আল্লাহ কবুল করেন

আল্লামা ইবনে কুদামা رحمه الله বর্ণনা করেছেন। বনী ইসরাঈলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। লোকজন সকলে মিলে হযরত মুসা عليه السلام-র দরবারে এসে উপস্থিত হল। নিবেদন করল, হে কালীমুল্লাহ! হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের দৃষ্টি দান করেন– রহমতের বৃষ্টি।

মুসা عليه السلام তাদের সঙ্গে উঠলেন। সকলে মিলে একটি খোলা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার কিংবা তারও

বেশি। মুসা ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আমাদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন। আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের উপর দয়া করুন। তৃণভোজী প্রাণীদের উপর করুণা করুন। আমাদের মধ্যে যারা বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও কুঁজো হয়ে গেছে, তাদের উপর দয়া করুন।

এভাবে মুসা ﷺ আল্লাহ ﷻ-র দরবারে দোয়া করছিলেন। কিন্তু আকাশ থেকে বৃষ্টি তো বর্ষিত হচ্ছিলই না, উল্টো যতটুকু মেঘ আকাশে দেখা যাচ্ছিল তা-ও দূরে সরে যাচ্ছিল। সূর্যের উত্তাপ ও প্রখরতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

মুসা ﷺ তেমনি দোয়া করে যাচ্ছিলেন– হে আমাদের রব! হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদের উপর আপনার রহমত নাযিল করুন।

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-র দোয়ার জওয়াবে অহী পাঠালেন, হে মুসা! কীভাবে আমি তোমাদের বৃষ্টি দান করব, অথচ তোমাদের মাঝে এমন এক লোক রয়েছে, যে বিগত চল্লিশ বৎসর যাবত নানা অন্যায় ও পাপাচার করে করে আমার না-ফরমানি করে যাচ্ছে! যেন আমার অবাধ্যতা আর বিরুদ্ধাচারণই তার কাজ?! সুতরাং, আমি কীভাবে তোমাদের বৃষ্টি দান করব? বরং তুমি সকলের মাঝে ঘোষণা করে দাও সে যেন তোমাদের মাঝ থেকে বের হয়ে যায়। তার কারণেই আমি তোমাদের বৃষ্টি বন্ধ রেখেছি।

মুসা ﷺ উঁচু আওয়াজে সমবেত মানুষের মাঝে ঘোষণা করলেন– যে গুনাহগার ও পাপী বান্দা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত আল্লাহ ﷻ-র অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করে আসছ, তুমি আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমার কারণেই আল্লাহ ﷻ আমাদের বৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছেন।

ঘোষণা শুনে গুনাহগার লোকটি এদিক-সেদিক তাকাল। ডানে-বামে দেখল। কিন্তু কাউকেই সে বেরিয়ে যেতে দেখল না। সে নিশ্চিত বুঝে নিল সে-ই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। তাকেই বেরিয়ে যেতে বলা হচ্ছে।

সে ভাবতে লাগল, আজ যদি আমি এখান থেকে বের হই, তা হলে পুরো বনী ইসরাঈলের মাঝে আমার অন্যায় ও অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর যদি আমি এখানে তাদের সঙ্গো থেকে যাই, তা হলে আমার কারণে তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করা হবে। এমতাবস্থায় সে ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত হল। আক্ষেপ ও অনুশোচনায় দগ্ধ হল। চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক পর্যায়ে সে লজ্জায় ও অনুশোচনায় কাপড়ের নীচে মাথা লুকাল। মনে মনে আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! হে আমার মাওলা! দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত আমি আপনার অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করে আসছি। এ দীর্ঘ সময় আপনি আমাকে অবকাশ দিয়েছেন। কখনও আমার অপরাধ মানুষের সামনে প্রকাশ করেননি। হে আল্লাহ! আমি আমার সারা জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করছি। আজ আমি পূর্ণ অনুগত হয়ে আপনার দরবারে হাজির হচ্ছি। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে কবুল করুন। আমাকে ফিরিয়ে দিবেন না। এভাবে সে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকল।

এদিকে তার কথা তখনও পূর্ণ হয়নি, এরই মধ্যে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা গেল এবং তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করল। এমনকি বৃষ্টির ফোঁটা মশকের মুখের মতো হয়ে পড়তে লাগল।

এ দেখে মুসা ﷺ যারপরনাই বিস্মিত হলেন। আল্লাহ ﷻ-র দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করেছেন, অথচ এখনও তো আমাদের মধ্য থেকে কেউ বের হল না!

আল্লাহ ﷻ বললেন, মুসা! আমি যার কারণে এতদিন তোমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রেখেছিলাম, এখন তার কারণেই তোমাদের বৃষ্টি দিচ্ছি।

এ কথা শুনে মুসা ﷺ আরও আশ্চর্য হলেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সেই বান্দাকে দেখতে চাই।

আল্লাহ ﷻ বললেন, মুসা! যখন সে আমার না-ফরমানি ও অবাধ্যতা করত তখনই আমি তাকে প্রকাশ করিনি, আর আজ যখন সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, তখন কি আমি তাকে প্রকাশ করে দিব?!!

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক! আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর কেনই বা তিনি ক্ষমা করবেন না? তিনি তো বান্দার প্রতি যারপরনাই দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। বান্দার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾ وَ اَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَ اتَّبِعُوْۤا اَحْسَنَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۷﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۹﴾ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۶۰﴾ وَ يُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۶۱﴾

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও, তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর, তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে; যাতে কেউ না বলে, হায়! হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে অবহেলা করেছি, তার জন্য আফসোস; আর আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের

একজন হতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব। হাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহঙ্কার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দিবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [সূরা যুমার : ৫৩-৬১]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً﴾

হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে [ক্ষমা পাওয়ার] আশা করতে থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক আমি তোমাকে ক্ষমা করব। এতে আমি কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আসমানের কিনারা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। এতে আমি কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পুরো পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তা হলে আমিও তোমার কাছে পুরো পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪০]

হাঁ, আল্লাহ ﷻ পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হবেন। আল্লাহ ﷻ-র রহমতের শান দেখুন। তিনি বান্দাকে গুনাহে লিপ্ত দেখেন,

অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করতে দেখেন, কিন্তু এর প্রতিকার আযাব ও পাকড়াও দিয়ে করেন না। বরং বান্দাকে কিছু রোগ-শোক, বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। যেন বান্দা ফিরে আসে; না-ফরমানি ছেড়ে আনুগত্য করে; আসমানের দুয়ারে কড়া নাড়ে; আল্লাহমুখী হয়ে দোয়া-মুনাজাত ও বিপদমুক্তির প্রার্থনা করে।

হাঁ, বান্দা যখন আল্লাহ ﷻ-র দরবারে ফিরে আসে, আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করে, পরিপূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হয়, আল্লাহর রহমত তখন বান্দার নিকটবর্তী হয়, বান্দার উপর অফুরন্ত করুণা বর্ষিত হয়। বান্দার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন; তার বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবত দূর করে দেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِيْ الرَّخَاءِ.

যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পরিমাণে দোয়া করে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৮২]

এক যুবকের ঘটনা

তার সাথে আমার পরিচয় ইউনিভার্সিটিতে। আমি তার কথা কখনও ভুলতে পারব না। সে ছিল টগবগে এক যুবক। আমার দেখা মানুষের মধ্যে সুন্দরতম চেহারার অধিকারী, সুঠাম সুশ্রী ও অসাধারণ এক যুবক। তার যৌবন ও হৃষ্টপুষ্টতা যেন দেহ বেয়ে ঝরে পড়ত।

তবে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পর সে-ও অন্যান্যদের মতো হারিয়ে গিয়েছিল। দু'জনের মাঝে আর কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না।

হঠাৎ একদিন সে আমাকে ফোন করে তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। বলল, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। কেন পারছি না তা জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে আমাদের বাসায় এলেই বুঝতে পারবেন আমার অপারগতা কোথায়।

কথাগুলো সে বলছিল অত্যন্ত বিষণ্ন কণ্ঠে। অতঃপর সে আমাকে তাদের বাসার ঠিকানা ও যাওয়ার পথ বলে দিল।

একদিন আমি তাদের বাসায় গেলাম। দরজায় নক করলাম। তার এক ছোট ভাই দরজা খুলে আমাকে তার কামরায় নিয়ে গেল। তার কামরায় গিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। সে একটি সাদা খাটের উপর শুয়ে আছে। পাশেই রয়েছে তার চলাচলে সাহায্যকারী বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও নানা ধরনের ঔষধপত্র। তার শরীরটা একেবারে ভঙ্গুর অবস্থায় খাটের উপর পড়ে আছে। আমাকে দেখে সে সালাম করার জন্য উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

আমি তার মাথার পাশে গিয়ে বসলাম। কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। বললাম, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো। ইতিপূর্বে আমি তোমার অসুস্থতা সম্পর্কে জানতাম না। কিন্তু তোমার এ অবস্থা হল কীভাবে? কী হয়েছে তোমার? তুমি তো আমাদের সাথে একই সঙ্গে ভার্সিটি থেকে বের হয়েছ! তুমি না আমাকে বলতে– অচিরেই তুমি বিয়ে করবে, বাড়ি বানাবে, গাড়ি কিনবে!

সে বলল, হাঁ তাই। তবে হঠাৎ আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটে গেল, যা আমার কল্পনাতেও কোনোদিন আসেনি।

এই তো কিছুদিন পূর্বে ভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হলাম। কিছুদিনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত একটি চাকুরিও পেয়ে গেলাম। দিনগুলো

বেশ ভালোই কাটছিল। সুখের সেই দিনগুলোতে আমার কোনো কষ্টই ছিলই না। শুধু মাঝে মধ্যে একটু মাথা ব্যথা করত। প্রথম প্রথম ব্যথাটা হালকাই ছিল। বেশি ভোগাত না। ধীরে ধীরে তা বাড়তে লাগল। কিছুদিন পর যুক্ত হল দৃষ্টির দুর্বলতা।

হঠাৎ একদিন মাথাব্যথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। অনন্যোপায় হয়ে হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তার দেখে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দিলেন। মাথার সূক্ষ্ম এক্স-রে করালেন। এক্স-রে রিপোর্ট বের হওয়ার পর ডাক্তার তা বারবার উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন– লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

কিছুক্ষণ পর তিনি টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে কারও সঙ্গে কথা বললেন এবং বড় বড় ডাক্তারদের একটি বোর্ড আহ্বান করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তারগণ এসে উপস্থিত হলেন। বোর্ডের সকল ডাক্তার মিলে আমার রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তারা সবাই তখন ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। এ দীর্ঘ সময়ে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম, সমস্যা হয়তো তেমন বড় কিছু নয়। দু'-এক ডোজ ঔষধে মাথাব্যথা আর দু'-এক ফোঁটা ঔষধে চোখের সমস্যা ভালো হয়ে যাবে। এরপর সবকিছু ঠিকঠাক ও আগের মতো হয়ে যাবে। আমি যখন এসব ভাবছিলাম, ঠিক তখন একজন ডাক্তার হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন এবং আমাকে স্তব্ধ করে দিয়ে বলে যেতে লাগলেন–

'শোনো হে অমুক! তোমার ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলছে তোমার মাথায় টিউমার হয়েছে। যার আকার ও আয়তন একটু একটু বেড়েই চলছে এবং তা বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সেটি ভিতর থেকে তোমার চোখের রগের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে তোমার দৃষ্টিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। টিউমারের স্ফীতি যেকোনো সময় আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে তোমার চোখের রগগুলো ফেটে যাবে এবং তুমি

অন্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর তোমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ দেখা দিবে এবং তুমি মারা যাবে।'

ডাক্তারের কথাগুলো বজ্রের ন্যায় আমার কানে বাজল। আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি বিকট আওয়াজে চিৎকার করে উঠলাম।

ডাক্তার বললেন, এটাই সত্য। তোমার রিপোর্টগুলো তা-ই বলছে। তোমার মাথায় টিউমার হয়েছে এবং খুব দ্রুতই তার চিকিৎসা করতে হবে। অন্যথায় যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা। আজ রাতেই আমরা তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে চাই। অতঃপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামীকাল তোমার মাথায় অস্ত্রোপচার করতে চাই। তোমার মাথার খুলি খুলে সেখান থেকে টিউমার অপসারণ করতে হবে। অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ার পর পুনরায় মাথার খুলি যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে দেওয়া হবে। এ বলে ডাক্তার আমার সামনে একটি কাগজ [অপারেশনের সম্মতিপত্র] বাড়িয়ে দিলেন এবং তাতে স্বাক্ষর করতে বললেন।

সংবাদের আকস্মিকতায় আমি একেবারেই হতবুদ্ধি ছিলাম। স্থির করতে পারছিলাম না এখন আমার কী করণীয়। কিছুক্ষণ ভেবে আমি স্বাক্ষর না করে সেখান থেকে বেড়িয়ে এলাম। কোনোভাবেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। ভাবতে লাগলাম, এখন আমার করণীয় কী! আমি কি বাসায় চলে যাব না অন্যকোনো হাসপাতালে যাব! দ্রুত ভাবনা-চিন্তা শেষ করে সিদ্ধান্ত নিলাম অন্য হাসপাতালে যাব।

সেখানেও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার সে সংবাদই দিলেন, যা দিয়েছিলেন আগের ডাক্তারগণ। এ ডাক্তারও দ্রুত অপারেশন করে ফেলার পরামর্শ দিলেন।

ততক্ষণে আমার মন কিছুটা শক্ত হয়ে এসেছে। ফোনে আব্বার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি হাসপাতালে চলে এলেন। আমার পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ। বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। হাসপাতালে এসে তিনি আমার নির্বাক ও ফ্যাকাশে চেহারা দেখে

ঘাবড়ে গেলেন। আমি কিছুটা শক্ত হয়ে বললাম, আব্বাজান! আপনি তো জানেন, ইতিপূর্বে আমি প্রায়ই আমার মাথাব্যথার অভিযোগ করতাম। এখন আমার ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রিপোর্ট বলছে- আমার মাথায় টিউমার হয়েছে এবং খুব দ্রুতই তা অপারেশন করে অপসারণ করতে হবে।

আমার কথা শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন- লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এর পরই তিনি মাটিতে বসে পড়লেন। বারবার বলতে লাগলেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে তিনি বললেন, বাবা! তুমি ঘাবড়িয়ো না। আমি তোমাকেও আমেরিকাতে তোমার ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিব। সেখানে তুমি চিকিৎসা নিবে এবং এক সময় সুস্থ হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

কথাগুলো তিনি বলছিলেন আর হয়তো আমার বড় ভাইকে নিয়ে যে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করছেন তা স্মরণ করছিলেন। আমার বড় ভাই দীর্ঘ এক বছর যাবত আমেরিকাতে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন। আমি আমার পিতাকে কতদিন দেখেছি ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলছেন আর কাঁদছেন! কতদিন দেখেছি শেষ রাতে মুসল্লাতে বসে ভাইয়ের জন্য দোয়া করছেন।

আমি আমার পিতার দিকে তাকালাম। বুকের কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে দু' গাল বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তিনি দেখছেন- তার সন্তানরা একে একে তার চোখের সামনেই মারা যাচ্ছে। আমার ভাই খালেদ, গত দু' বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বড় ভাই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকাতে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। আর আমি এমন এক পথে রওয়ানা হয়েছি, যার শেষ গন্তব্য কোথায় জানা নেই।

এক সময় আমাকেও আমেরিকাতে পাঠানো হল। আমি আমেরিকা গেলাম। উন্নত এক হাসপাতালে ভর্তি হলাম। তারা দ্রুততম সময়ে আমার যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করলেন এবং পরদিন সকালেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। আমার মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে

ফেললেন। দেহ অবশ করা হল। অতঃপর চারও দিক থেকে বৃত্তাকারে কেটে মাথার খুলির উপরের অংশ সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেললেন। তারপর যথানিয়মে অস্ত্রোপচার করে সেখান থেকে টিউমার অপসারণ করলেন।

এভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেল। এ দীর্ঘ সময় যাবত অপারেশন চলছিল এবং তা ভালোভাবেই চলছিল। হঠাৎ আমার মস্তিষ্কের শিরায় রক্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে তা বিভিন্ন শিরা-উপশিরায় আটকে যায়। ফলে মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তচাপ সৃষ্টি হয়। এতে ডাক্তারগণ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এর সমাধান করতে গিয়ে ভুলবশত মস্তিষ্কের কিছু অংশে নাড়া লেগে যায়। এতে করে আমার শরীরের একাংশ অবশ হয়ে যায়।

ডাক্তারগণ বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত অপারেশনের বাকি কাজগুলো সম্পন্ন করেন। মাথার খুলি আপন স্থানে বসিয়ে তার উপর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেন। অতঃপর সেলাই করে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করে আমাকে নিয়ে যান নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে।

অপারেশন সম্পন্ন হওয়ার পর পূর্ণ পাঁচ ঘণ্টা আমি অচেতন অবস্থায় ছিলাম। এরপর হঠাৎ আমার বাম পায়ে খিঁচুনি দেখা দেয়। ডাক্তারগণ আবার আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যান এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার সমাধান করেন। অতঃপর আবার আমাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

এরপর প্রায় চার ঘণ্টা আমার অবস্থা স্থিতিশীল থাকে। তারপর দেখা দেয় আরেক বিপদ– শ্বাসযন্ত্রে রক্তক্ষরণ। ডাক্তারগণ আবারও আমাকে দ্রুত অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যান এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তক্ষরণের সমাধান করেন। অতঃপর আবার আমাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

আমার চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারগণ হতবুদ্ধি হয়ে যান। একের পর এক রোগের আক্রমণ। ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন। হঠাৎ এমন

সমস্যার সূত্রপাত, যার সমাধান খুবই কস্টকর। এ যেন রোগের শেষ নেই, বিপদের সমাপ্তি নেই।

এরপর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আমার অবস্থা স্থিতিশীল থাকে। ডাক্তারগণ আমার মধ্যে কিছুটা সুস্থতা ও উন্নতি অনুভব করেন। এরই মধ্যে হঠাৎ শরীরের তাপমাত্রা আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে যেতে লাগল। ডাক্তারগণ দ্রুত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করালেন। রিপোর্ট এল– খুলির যে অংশের নীচ থেকে টিউমার অপসারণ করা হয়েছে, তাতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। অবস্থার অবনতি দেখে ডাক্তার আবার অপারেশন টিম আহ্বান করলেন। তারা সকলে মিলে আমাকে জানাযার মতো বহন করে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। তখন আমার হুঁশ ছিল।

আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকালাম, কাঁদলাম এবং কায়মনোবাক্যে অনুনয়-বিনয় করে বারবার বলতে লাগলাম– হে আল্লাহ! হে আমার রব! হে আমার মেহেরবান মাওলা! আমি অক্ষম, অসহায়। আমি বিপদগ্রস্ত। আপনি সকল দয়াময়ের শ্রেষ্ঠ দয়াময়। হে আল্লাহ! এ যদি আমার উপর আপনার পক্ষ থেকে শাস্তি হয়ে থাকে, তা হলে আমি আপনার দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর যদি এ আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ে থাকে, তা হলে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করুন; এর বিনিময়ে আমার পুণ্য ও প্রতিদান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিন।

এরপর আমি মৃত্যুর কথা স্মরণ করলাম। আল্লাহর কসম!–

– আমার বিপদ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

– আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

– হয়তো আগামীকালই মাটি আমার বিছানা হবে।

– আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে এসেছে।

– আমার দেহ পোকা-মাকড়ে খাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

সেদিন আমার কী অবস্থা হবে–

– যেদিন পা পিছলে যাবে।

– মানুষ কান্নাকাটি করবে। আফসোস অনুশোচনা ও অনুতাপ দীর্ঘায়িত হবে।

সেদিন আমার কী অবস্থা হবে–

– যেদিন সেই সত্তার সামনে দাঁড়াব, যিনি আমার ছোট-বড় সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন।

– যেদিন অপরাধীদের পা পিছলে যাবে।

– যেদিন আহাজারি ও হা-হুতাশ সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

– যেদিন দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও স্বাদ-উপভোগ স্বপ্নের মতো শেষ হয়ে যাবে।

– সেদিন আমার কী অবস্থা হবে!

এরপর আমি কাঁদলাম। অনেক কাঁদলাম এবং খুব করে বেঁচে থাকার কামনা করলাম। তবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জন্য নয়। বরং আমার মাওলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সংশোধন ও স্থায়ী করার জন্য।

হঠাৎ ডাক্তার এলেন এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবশ করার আদেশ দিলেন। অবশ করার পর চামড়া খুলে পুরো খুলিটা আলাদা করে ফেললেন। অতঃপর খুলি ছাড়াই চামড়া দিয়ে মাথা ঢেকে সেলাই করে দিলেন।

যখন আমি জ্ঞান ফিলে পেলাম, লক্ষ করলাম আমার মাথা নরম। তা হলে এর হাড় কোথায়। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মাথার বাকি অংশ কোথায়।

ডাক্তার খুব ধীর ও শান্ত গলায় বললেন, তোমার মাথার খুলি আমাদের কাছে রেখে দিয়েছি– জীবাণুমুক্ত করার জন্য। ছয় মাস পর পুনরায় তুমি আমাদের কাছে এসো। তোমার মাথার খুলি যথাস্থানে লাগিয়ে দিব।

– যেদিন পা পিছলে যাবে।

– মানুষ কান্নাকাটি করবে। আফসোস অনুশোচনা ও অনুতাপ দীর্ঘায়িত হবে।

সেদিন আমার কী অবস্থা হবে–

– যেদিন সেই সত্তার সামনে দাঁড়াব, যিনি আমার ছোট-বড় সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিবেন।

– যেদিন অপরাধীদের পা পিছলে যাবে।

– যেদিন আহাজারি ও হা-হুতাশ সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

– যেদিন দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও স্বাদ-উপভোগ স্বপ্নের মতো শেষ হয়ে যাবে।

– সেদিন আমার কী অবস্থা হবে!

এরপর আমি কাঁদলাম। অনেক কাঁদলাম এবং খুব করে বেঁচে থাকার কামনা করলাম। তবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জন্য নয়। বরং আমার মাওলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সংশোধন ও স্থায়ী করার জন্য।

হঠাৎ ডাক্তার এলেন এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবশ করার আদেশ দিলেন। অবশ করার পর চামড়া খুলে পুরো খুলিটা আলাদা করে ফেললেন। অতঃপর খুলি ছাড়াই চামড়া দিয়ে মাথা ঢেকে সেলাই করে দিলেন।

যখন আমি জ্ঞান ফিলে পেলাম, লক্ষ করলাম আমার মাথা নরম। তা হলে এর হাড় কোথায়। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মাথার বাকি অংশ কোথায়।

ডাক্তার খুব ধীর ও শান্ত গলায় বললেন, তোমার মাথার খুলি আমাদের কাছে রেখে দিয়েছি– জীবাণুমুক্ত করার জন্য। ছয় মাস পর পুনরায় তুমি আমাদের কাছে এসো। তোমার মাথার খুলি যথাস্থানে লাগিয়ে দিব।

এরপর আমেরিকাতে আমি এক মাস ছিলাম। তারপর রিয়াদে চলে এসেছি। এখন ছয় মাসের বাকি সময়টুকু শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছি।

– আমি আমার জীবনের মূল মাকসাদ থেকে উদাসীন ছিলাম।

– গাফলতের ঘুমে বিভোর ছিলাম।

– দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত ছিলাম।

– বিপদ-আপদ, পরীক্ষা ও মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

– দুনিয়াবী জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম।

– দুনিয়াবী জীবন নিয়েই পড়ে ছিলাম।

– এখন আমি নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করলাম।

প্রিয় পাঠক!

এরপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। ওই যুবক পক্ষাঘাতগ্রস্থতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এখন সে নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারে।

– সাত মাস পর...

আমি আবার তাকে দেখতে গেলাম। তখন দেখলাম, তার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল, প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত। হাসিমাখা মুখে সে আমার দিকে একটি কার্ড বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখি বিয়ের কার্ড। আমাকে তার বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছে!

আমি যতটুকু জানি–

– এখন সে কল্যাণের কাজে অন্যদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী।

– অত্যন্ত আগ্রহী ও উদ্যমী।

– অন্যকে নেক ও কল্যাণের কাজে উৎসাহ দানকারী।

এখন সে–

– মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র দিকে ডাকে।

– দ্বীনের পথে আহবান করে।

– বিভিন্ন কিতাবাদি রচনা ও তা মানুষের মাঝে বিতরণ করে।

– অক্ষম-অসহায় ও অনাথ-দুঃস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করে।

– অসহায়-দরিদ্রদের পাশে থাকে। সাহায্য-সহযোগিতা করে।

– ইত্যাকার আরও বহু কল্যাণকর ও নেক কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে।

প্রিয় পাঠক!

মনে রাখবেন, জীবনের মোড়ে মোড়ে, নানা দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের বাঁকে বাঁকে বহু দান-অনুদান ও উপহার লুকায়িত থাকে।

তাওবাকারী আল্লাহর প্রিয়

তাওবাকারীরা আল্লাহ ﷻ-র প্রিয়পাত্র। আল্লাহ ﷻ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। এ ঘোষণা তিনি তাঁর পবিত্র কিতাবের স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরও ভালোবাসেন। [সূরা বাকারা : ২২২]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদকা কবুল করেন? বস্তুত আল্লাহই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা : ১০৪]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾

তিনি [আল্লাহ] তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। [সূরা শূরা : ২৫]

আল্লাহ ﷻ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন। তবে তিনি পাপাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। কত গুনাহগার ও পাপী সকাল-সন্ধ্যা হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে, অথচ–

– তাদের রব উপর থেকে তাদের উপর লানত করতে থাকেন।

– ফেরেশতারা ক্রোধান্বিত হতে থাকেন।

– নেককার বান্দারা তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে থাকেন।

– জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য উত্তপ্ত হতে থাকে। তাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

আল্লাহ ﷻ তাদের চোখ-কান সম্পূর্ণ সুস্থ রেখেছেন। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম রেখেছেন, অথচ তারা–

– না-ফরমানি ও অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

– শয়তানের সহযোগিতা ও তার অনুসরণ করে।

– বিরামহীন অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে।

– তাওবা তো করেই না, উল্টো খাহেশাতে নাফসানী ও শয়তানের ফাঁদে পড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করতেই থাকে।

আশ্চর্য! আল্লাহ ﷻ নেয়ামত দান করেন আর সেই নেয়ামতের মাধ্যমেই তারা নেয়ামতদাতার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। আরে, তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি, তোমার কী অবস্থা হত, যদি তুমি–

– পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে?

– কিংবা আরও ভয়ংকর কোনো রোগে আক্রান্ত হতে?

– তোমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হত?

– কিংবা তোমাকে বধির বানিয়ে দেওয়া হত?

– তা হলে তুমি কী করতে?

– তোমার কী করার থাকত?

– একবারও কি ভেবেছ?! ভেবে দেখেছ?!!

যেকোনো সময়, মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ ﷻ তোমার সুস্থতার নেয়ামত ছিনিয়ে নিতে পারেন। একেবারে বিছানায় শুইয়ে দিতে পারেন। তখন তোমার কী করার থাকবে?

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার সেনাবাহিনীর এক মেজর তার এক অসুস্থ সহকর্মীকে দেখার জন্য হাসপাতালে গেলেন। হাসপাতালে গিয়ে তার সঙ্গো সাক্ষাৎ করলেন, তার খোঁজ-খবর নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় তার কাছে কাটালেন। দেখা-সাক্ষাৎ শেষে ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন; তার জন্য সুস্থতা ও কল্যাণের দোয়া করলেন।

অতঃপর যখনই রুম থেকে বের হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন, অমনিই পা পিছলে ফ্লোরে পড়ে গেলেন। পড়ার সময় রোগীর বেডের পাশে রাখা ছোট্ট টেবিলের সঙ্গো ধাক্কা লেগে মাথায় আঘাত পেলেন। এতে করে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আল্লাহর কী মর্জি! এ থেকেই এক সময় তার চারও হাত-পা অবশ হয়ে গেল। আমি যতটুকু জানি, এখনও তিনি হাসপাতালেই আছেন। সেই ঘটনার পর আজ প্রায় দশ বছর কেটে গেছে!

কিছুক্ষণ... রোগী ও অসুস্থদের সাথে!

আমি এক যুবককে চিনি। সে গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহে সে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্ঘটনায় তার হাত-পা সবই হারাতে হয়েছে। তার উভয় হাত ও উভয় পা-ই কেটে ফেলতে হয়েছে।

একবার আমি এক রোগী দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। হাসপাতালের ভিতর যখন করিডোর দিয়ে হাঁটছিলাম, হঠাৎ এক রুম থেকে টেলিফোনের রিং বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি রুমের ভিতর একজন রোগী। রোগীটি আমাকে দেখেই ডাকতে লাগল— শায়খ! শায়খ!! আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। হাত-পা কিছুই নাড়াতে পারেন না। তার পাশেই টেলিফোনটা বাজছে।

তিনি আমাকে বললেন, শায়খ! দয়া করে রিসিভারটা একটু উঠিয়ে দিন! আমার সঙ্গে এক যুবক ছিল। আমি রিসিভার তুলে দেওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি রিসিভারটি তুলে রোগীর কানের কাছে নিয়ে গেল। তারপর তিনি কথা বললেন।

আমি লক্ষ করলাম, তিনি একমাত্র তার মাথাটি ছাড়া আর কিছুই নাড়াতে পারেন না। তার সমস্ত শরীর অবশ— নড়াচড়াহীন। কথা বলা শেষ হলে তিনি যুবককে রিসিভারটা স্বস্থানে রেখে দিতে অনুরোধ করলেন। যুবক তা-ই করল।

এরপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বয়স কত?

তিনি বললেন, আটত্রিশ বছর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত বছর যাবত আপনি এ অবস্থায় আছেন?

প্রিয় পাঠক!

তাকে দেখে আমার বড় মায়া লাগল। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করি, আল্লাহ ﷻ তাকে সুস্থ করে দিন। বেচারার অবস্থা এমন যে, যদি একটি মাছিও এসে তার নাকে বসে, তা হলে সেটিও তাড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। খুবই করুণ অবস্থা তার। যাহোক, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কত বছর যাবত আপনি এ অবস্থায় আছেন?

তিনি বললেন, আঠারো বছর যাবত!

অর্থাৎ তার বয়স যখন বিশ বছর ছিল, তখন থেকে তিনি এ অবস্থায় আছেন।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন তো! একজন মানুষ সুদীর্ঘ আঠারোটি বছর যাবত এ অবস্থায় আছেন!!

শুধু কি তাই! আমাদের মাঝে কত জনের জীবনেই তো কত রকম আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কেউ নিজ হাতে জামা গায়ে দেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ চান যে, তার জামাটা অন্যকেউ খুলে দিক। হাঁ, যিনি নিজ হাতে জামা গায়ে দিয়েছেন, জামার বোতাম লাগিয়েছেন, হঠাৎ তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, জামার বোতামগুলো অন্য কেউ খুলে দিতে হয়। তিনি আর নিজ হাতে বোতামগুলো খুলতে পারেন না; জামাটা শরীর থেকে ছাড়তে পারেন না।

আরেকবার এক হাসপাতালের করিডোর দিয়ে হাঁটছিলাম। দেখলাম, পাশেই একটি দরজা-বন্ধ কামরা। কামরার দরজায় এক-দুই বিঘত পরিমাণ একটি ছিদ্র রয়েছে। পুরো কামরার দেয়াল ও মেঝেতে স্পঞ্জ লাগানো। তার ভিতর একজন রোগী আছেন।

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব! তার এ অবস্থা কেন? কেন আপনারা তাকে এখানে বন্দি করে রেখেছেন?

তিনি বললেন, লোকটি একজন পাগল। তার সমস্যা হচ্ছে– তিনি সামনে কোনো দেয়াল দেখতে পেলেই তাতে মাথা দিয়ে আঘাত

করতে থাকেন। তাই তাকে এভাবে বন্দি করে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আমরা তার ঘরের দেয়াল ও মেঝো সবখানেই স্পঞ্জ লাগিয়ে দিয়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার এ অবস্থা কত দিন যাবত?

ডাক্তার সাহেব বললেন, বিশ কি পঁচিশ বছর হবে। এ দীর্ঘ সময় যাবত তিনি এই একই কামরায় বন্দি! এখানেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করেন! এই একটি কামরার ভিতরই তার জীবনের পরিধি সীমাবদ্ধ।

তারপর আমরা আরেকটি কামরার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। দেখলাম, সেখানে তিনজন লোককে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার সাহেব! এদেরকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে কেন?

ডাক্তার সাহেব বললেন, কারণ– যদি তাদের বাঁধন খুলে দিই, তা হলে তারা গিয়ে মানুষকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। তাই তাদেরকে বেঁধে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে এভাবে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়। হাসপাতালের নার্স ও সেবকরা এসে সময়মতো তাদের খাবার দিয়ে যায়। তারা নিজেদের খাবার-পানি ইত্যাদি নিজ থেকে চাইতেও সক্ষম নন। এভাবে সারাদিন তারা বাঁধা অবস্থায় থাকেন। রাত এগারোটা-বারোটার দিকে যখন ঘুমের প্রভাবে তাদের মাথা ঢুলতে থাকে, তখন তাদের বাঁধন খুলে দিয়ে খাটের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তারা ঘুমিয়ে যান।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের এ অবস্থা কত দিন যাবত?

ডাক্তার সাহেব বললেন, একজনের তেরো বছর, আরেকজনের আট বছর, তৃতীয়জনের দশ বছর।

তারপর আমরা গেলাম আরেকটি কামরার সামনে। সেখানে দেখলাম, একদল লোককে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাদের একজনের বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। তার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। দেখলাম এ লোকটি সম্পূর্ণ উলঙ্গা; গায়ে একটি সুতাও নেই।

আমি যারপরনাই আশ্চর্য হলাম। সবিস্ময়ে বললাম, ডাক্তার সাহেব! আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করুন। যদিও লোকটি পাগল, কিন্তু তাকে এভাবে বিবস্ত্র অবস্থায় রাখা আপনাদের জন্য উচিত হয়নি।

ডাক্তার সাহেব বললেন, শায়খ! আমরা যদি তাকে কোনো কাপড় পরিধান করাইও, সে তা গায়ে রাখে না। দাঁত দিয়ে কামড়াতে শুরু করে। টুকরো টুকরো করে ফেলে। অতঃপর তা দিয়ে নিজের ও অন্যদের শ্বাসরোধ করতে উদ্যত হয়। কখনও বা কাপড়ের টুকরোগুলো খেতে শুরু করে। তারপর বমি করতে থাকে। তাই তাকে এভাবে রাখা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছেন। তিনি হাসপাতালের এক কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কামরা থেকে বিকট আওয়াজ ও চিৎকার শুনতে পেলেন। একজন রোগী এত জোরে চিৎকার করছে যে, কলজে ফেঁটে যাওয়ার উপক্রম।

বন্ধু বলেন, আমি কামরায় প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে দেখি, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন রোগী বেডের উপর চিৎকার করছেন। রোগীর পাশেই ছিল হাসপাতালের সেবক। আমি তাকে রোগীর চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

সেবক বলল, ইনি সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার শরীরের একটি অঙ্গও তিনি নাড়াতে সক্ষম নন। তার পরিপাকযন্ত্রেও সমস্যা। খাবার হজম করতে কষ্ট হয়। যেকোনো খাবার খাওয়ানোর পর তার এ অবস্থা হয়। পাকস্থলি ও হজমের কষ্টে তিনি চিৎকার করছেন।

বন্ধু বলেন, আমি সেবককে বললাম, আপনারা তাকে শক্ত খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকবেন। গোশত, ভাত, রুটি ইত্যাদি শক্ত খাবার খাওয়াবেন না।

সেবক বলল, আপনি জানেন আমরা তাকে কী খাবার খাওয়াই? আল্লাহর কসম! আমরা তার পেটে একমাত্র কয়েক ফোঁটা দুধ ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করাতে পারি না। তা-ও পাইপের সাহায্যের নাকের ভিতর দিয়ে। সে সামান্য দুধটুকু হজম করতেই তার এই কষ্ট!

আরেকজন ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি হাসপাতালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত এক রোগীর কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রোগী তাকে দেখে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। তার আওয়াজ নাকে বাজছিল। সে কোনো কিছুই নিজে থেকে করতে পারত না।

ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার ডাক শুনে কামরায় প্রবেশ করলাম। দেখি, তার সামনে ছোট্ট একটি কাঠের টুল। তার উপর একটি কুরআন খোলা। রোগী বহুক্ষণ যাবত কুরআনের দু'টি পৃষ্ঠাই বারবার তেলাওয়াত করছিলেন। যখন এ দুই পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যেত, তখন আবার শুরু থেকে পড়া শুরু করতেন। এভাবেই তেলাওয়াত করছিলেন। কারণ, কুরআনের পাতা উল্টানোর মতো শক্তিও তার ছিল না। পাশে এমন কেউও ছিল না, যে তাকে সাহায্য করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনি আমাকে অনুরোধ করে বললেন, যদি দয়া করে পৃষ্ঠাটা একটু উল্টিয়ে দিতেন!

আমি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। সাথে সাথেই তিনি কুরআনের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললাম, কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি তার আগ্রহ ও আমাদের উদাসীনতা দেখে; তার অসুস্থতার ভয়াবহতা ও আমাদের সুস্থতার কথা ভেবে!

এ হল অসুস্থ ও রোগীদের কিছু খণ্ডচিত্র। অতএব, হে সুস্থ সবল ও নীরোগ! ওহে আপদশূন্য ও বালা-মসিবত থেকে নিরাপদ! তুমি আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছ; আল্লাহ ﷻ-র আযাব, শাস্তি ও পাকড়াও থেকে গাফেল হয়ে আছ! আল্লাহ ﷻ তোমাকে কত নেয়ামত দিয়েছেন, তোমার সঙ্গে কত সুন্দর আচরণ করছেন, কিন্তু তুমি তার বদলা দিচ্ছ তাঁর অবাধ্যতা ও না-ফরানির মাধ্যমে! আরে–

– তোমার উপর তাঁর নেয়ামত কি অজস্র-অগণিত নয়?

– তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ কি অফুরন্ত নয়?

– তুমি কি এ ভয় কর না যে, আগামীকাল তোমাকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে?

অতঃপর তোমাকে বলবেন, হে আমার বান্দা!

– আমি কি তোমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করিনি?

– আমি কি তোমার দেহকে সুঠাম, সুশ্রী ও সবল করিনি?

– আমি কি তোমার রিযিক প্রশস্ত করে দেইনি?

– আমি কি তোমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন রাখিনি?

তখন তুমি বলবে, বলতে বাধ্য হবে, হাঁ; অবশ্যই।

তোমার এ জওয়াবের পর আল্লাহ ﷻ আবার তোমাকে প্রশ্ন করবেন–

– তা হলে কেন আমার নেয়ামতের না-শোকরি করেছ?

– কেন আমার নেয়ামতরাজি ভোগ করে আমারই অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছ?

– কেন তুমি নিজেই নিজেকে আমার শাস্তি ও ক্রোধের জন্য প্রস্তুত করেছ?

সেদিন তুমি কী জওয়াব দিবে? সেদিন তোমার যাবতীয় দোষত্রুটি সকলের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তোমার সকল অন্যায়, অনাচার ও পাপচার আবরণমুক্ত হয়ে যাবে। অতএব–

– আফসোস! তোমার জন্য।

– আফসোস! তোমার গুনাহের জন্য।

– তুমি কতই না হতভাগা!

– তুমি কতই না কপালপোড়া!

তোমার জীবনের সমীকরণ–

– শুরুটায় আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-আহ্লাদ।

– মাঝখানে বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবত।

– শেষটায় অন্তহীন ধ্বংস ও লয়-নিপাত।

আরে–

– গুনাহ ছাড়া আর কীসে নূহ ﷺ-র সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়েছে?

– গুনাহ ছাড়া আর কীসে কওমে আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছে?

– গুনাহ ছাড়া আর কীসে লূত ﷺ-র সম্প্রদায়ে পাথরবৃষ্টি ডেকে এনেছে? গুনাহ ছাড়া আর কোন জিনিসটা তাদের বাড়িঘর উল্টোনোর কারণ হয়েছে?

– গুনাহ ছাড়া আর কীসে শুআইব ﷺ-র সম্প্রদায়ের আযবকে ত্বরান্বিত করেছে?

– গুনাহ ছাড়া আর কোন জিনিসে আবরাহা বাদশাহ ও তার বাহিনীর উপর কংকরবৃষ্টি ডেকে এনেছে?

– গুনাহ ছাড়া আর কীসে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছে?

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। [সূরা আনকাবুত : ৪০]

অতএব, তুমি আশ্চর্য হয়ো না, যদি তুমি–

- তোমার গুনাহের কারণে দুনিয়াতে কোনো শাস্তিতে নিপতিত হও।
- শারীরিক কোনো অসুস্থতা বা সন্তানাদিকে নিয়ে কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হও।
- ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হও কিংবা রিযিকের সংকীর্ণতায় পর্যুদস্ত হও।
- কিংবা যদি তোমার দোয়া কবুল না হয়।
- একের পর এক বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবত, বিভিন্ন জটিলতা ও সংকট যদি তোমাকে ঘিরে নেয়।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ﴾

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, তা হলে দেখতে পেত তাদের পূর্বসুরিদের কী পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলেন এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। [সূরা মুমিন : ২১]

অতএব, দ্রুত তুমি তোমার যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবার দিকে ধাবিত হও। অনুতপ্ত হও সেইসব দিনের ব্যাপারে, যে দিনগুলোতে গুনাহের কালিমায় অন্ধকার করেছ আমলনামার সাদা-শুভ্র পাতাগুলোকে। ডুবে ছিলে অন্যায়-অনাচার আর পাপাচারে। ভারী করেছ পাপের বোঝা গভীর রাতের আঁধারে। কতই না দুঃসাহস দেখিয়েছ তুমি আসমান-জমিনের মালিকের বিরুদ্ধে। অতএব, আর দেরি না কারে এখনই গায়ে টেনে নাও অনুতাপ-অনুশোচনার চাদর–চূড়ান্ত পদস্খলনের পূর্বেই। ক্ষমা নিয়ে নাও যাবতীয় গুনাহ থেকে–সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই।

আজ এবং এখন থেকেই–

– নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর।

– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর।

– নফসকে শাসন কর।

– খাহেশাতের নফসানীর বিরোধিতা কর।

অপরদিকে দেখ, নেককার-বুযুর্গরা কেমন ছিলেন। তাঁরা –

– নিজেদের নফসকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে বাধ্য করতেন।

– যাবতীয় অন্যায় ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতেন।

হাঁ–

– তাঁরা যিনা করতে সক্ষম ছিলেন।

– গানবাদ্য শুনতে পারতেন।

– হারাম জিনিসের দিকে তাকাতে পারতেন।

– সুদ খেতে পারতেন।

– ঘুষ নিতে পারতেন।

– অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করতে পারতেন।

– অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হতে পারতেন।

এ সবই করতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে বিরত রেখেছেন।

তুমি কি মনে কর, তাঁরা এতে সক্ষম ছিলেন না?

– হাঁ, অবশ্যই সক্ষম ছিলেন।

তা হলে কোন জিনিস তাঁদেরকে বাঁধা দিয়েছিল?

তাঁরা ভয় করতেন –

– জাহান্নামের আগুনকে।

– জাহান্নামের রক্ত-পুঁজ ও ফুটন্ত পানি পান করাকে।

তাঁরা ভয় করতেন সেদিনকে, যেদিন –

– চক্ষু বিস্ফারিত হবে।

– প্রবল পরাক্রমশালীর ক্রোধ চরম আকার ধারন করবে।

– যেদিনের বিপত্তি হবে সুদূরপ্রসারী, ব্যাপক।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ﷺ খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগী করতেন। একদিন তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল– আব্বাজান! আপনি আরাম করবেন কখন?

তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন, যখন জান্নাতে প্রথম পা রাখব।

– সুবহানাল্লাহ!

অতএব, তুমি সঞ্চয় কর সেখানকার জন্য [জান্নাতের জন্য]। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। স্বল্প সময়ের জন্য দুনিয়ার মিথ্যে মায়া-মোহ থেকে চোখ বন্ধ করে রাখ। এখানে, এ দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তার সমষ্টিও জান্নাতী কোনো হুরের নখের কোণের সমানও হবে না। ওহে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে গাফেল! যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। তুমি তো জাগ্রত নও। বন্ধু-বান্ধব সবাই চলে গেছে। তুমি একা রয়ে গেছ। তারা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসেই সন্তুষ্ট ছিল। যারা রয়ে গিয়েছিল, তাদেরও অধিকাংশ পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে। অথচ তুমি বঞ্চনাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে আছ! আল্লাহর কসম! উক্ত মর্যাদার প্রত্যাশী কোনো তাওবাকারী এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; সন্তুষ্ট হতে পারে না। অচিরেই তুমি বুঝতে পারবে, যখন পর্দা উঠে যাবে, তুমি কী করেছ আর তোমার কী করার সম্ভাবনা ছিল!

তাওবাকারীর কর্তব্য

তাওবাকারীর কর্তব্য, তাওবা করার পর বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত, সমস্যা-সংকট, হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ– যা-ই আসুক, তাতে ধৈর্যধারণ করা; আল্লাহ ﷻ-র জন্য সবকিছু মেনে নেওয়া; সহ্য করে যাওয়া। কারণ, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। তারপর প্রত্যেকের মর্যাদা অনুপাতে। যার মর্যাদা যত বেশি তার পরীক্ষা তত বেশি। অতএব, বান্দার উপর একের পর এক বিপদাপদ আসতেই থাকে। অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহই থাকে না। তখন–

– সে গুনাহগারদের সংখ্যাধিক্যে প্রতারিত হয় না।

– খাহেশাতপূজারীদের রঙ-তামাশা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

– সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় না, শয়তান যাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। [সূরা আনআম : ১১৬]

তাওবাকারীর প্রকৃত জীবন

তাওবার পরের জীবনই একজন তাওবাকারীর প্রকৃত জীবন। ওহে! তোমার জীবনের কী স্বাদ থাকল, যদি তুমি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে আল্লাহর দুশমন ভাবো; সারাক্ষণই যদি খাহেশাতে নাফসানীর পূজায় লিপ্ত থাক; কোনো না কোনো গুনাহ ও হারামে লিপ্ত থাক! অথচ তোমার রব তিনি, যিনি তোমাকে খাওয়াচ্ছেন-পরাচ্ছেন; তুমি অসুস্থ হলে তোমাকে শেফা দিচ্ছেন; কাউকে মৃত্যু দান করছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। বরং তোমার দেহের প্রতিটি পশম, এমনকি পুরো সৃষ্টিজগতের অনু-পরমাণুও যাঁর অনুমতি ছাড়া সামান্যতম নড়াচড়াও করে না।

যে খাঁটি দিলে আল্লাহ ﷻ-র দরবারে তাওবা করে, সে তাওবার পর দ্বীনের শক্তিশালী ও মজবুত সৈনিকে পরিণত হয়। তখন সে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। সর্বদা দ্বীনের ফিকির বহন করে। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم আজমাইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-র হাতে হাত রেখে বাইআত হতেন আর তখন থেকেই নিজেকে দ্বীনের একজন সৈনিক বলে মনে করতেন। দ্বীনের জন্যে, দ্বীনের কল্যাণে ঝাপিয়ে পড়তেন।

দ্বীনের সৈনিক

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনাতে দ্বীনী দাওয়াত ও একটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হন, তখন তিনি অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের দিকেও মনোনিবেশ করেন। একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে লোক পাঠাতে শুরু করেন। একেকজন সাহাবীকে একেক অঞ্চল ও শহরে প্রেরণ করেন। কাউকে মিসরে, কাউকে শামে। কাউকে ইয়ামানে, আবার কাউকে ইরাকে।

সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন; দ্বীন শিক্ষা দিতেন। মানুষকে একত্ববাদ ও এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেন।

তেমনই একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেছেন 'ওয়াদীয়ে নোমান'-এ। 'ওয়াদীয়ে নোমান' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। নবীজী ﷺ এ সাহাবীকে প্রেরণের পূর্বে বলে দিলেন, তুমি সেখানে গিয়ে কিছু বেদুইন ও কাফেরকে পাবে, যারা লাত ও উজ্জার ইবাদত করে; বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে। তুমি তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিবে; এক আল্লাহ ﷻ-র পথে আহ্বান জানাবে।

সাহাবী রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওয়াদীয়ে নোমান-এ পৌঁছে বেদুইনদের দেখতে পেলেন; ভেড়া-বকরি আর উট-দুম্বাই ছিল যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; চিন্তা ও চেতনার প্রাণকেন্দ্র। এ ছাড়া আর তেমন কিছুই জানত না তারা।

দ্বীনের সৈনিক

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনাতে দ্বীনী দাওয়াত ও একটি ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হন, তখন তিনি অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের দিকেও মনোনিবেশ করেন। একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে লোক পাঠাতে শুরু করেন। একেকজন সাহাবীকে একেক অঞ্চল ও শহরে প্রেরণ করেন। কাউকে মিসরে, কাউকে শামে। কাউকে ইয়ামানে, আবার কাউকে ইরাকে।

সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন; দ্বীন শিক্ষা দিতেন। মানুষকে একত্ববাদ ও এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেন।

তেমনই একজন সাহাবীকে প্রেরণ করেছেন 'ওয়াদীয়ে নোমান'—এ। 'ওয়াদীয়ে নোমান' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম। নবীজী ﷺ এ সাহাবীকে প্রেরণের পূর্বে বলে দিলেন, তুমি সেখানে গিয়ে কিছু বেদুইন ও কাফেরকে পাবে, যারা লাত ও উজ্জার ইবাদত করে; বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে। তুমি তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিবে; এক আল্লাহ ﷻ-র পথে আহ্বান জানাবে।

সাহাবী রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওয়াদীয়ে নোমান-এ পৌঁছে বেদুইনদের দেখতে পেলেন; ভেড়া-বকরি আর উট-দুম্বাই ছিল যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; চিন্তা ও চেতনার প্রাণকেন্দ্র। এ ছাড়া আর তেমন কিছুই জানত না তারা।

সাহাবী নবীজীর উপদেশ ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদেরকে দ্বীনের পথে, ইসলামের পথে আহ্বান জানাতে শুরু করলেন; একত্ববাদের দাওয়াত দিতে লাগলেন; পাথরের মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতে নিমগ্ন হতে বললেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা কেউই ঈমান গ্রহণ করল না। বরং সবাই অস্বীকার করল এবং বলল, একজন অজানা-অচেনা আগন্তুকের কথায় আমরা কীভাবে আমাদের সেসব মাবুদের ইবাদত পরিত্যাগ করব, বহু বছর যাবত আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করে আসছে? এটা কখনোই হতে পারে না; কিছুতেই হতে পারে না। এ বলে তারা সবাই দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং অস্বীকৃতি জানাল– শুধু একজন ছাড়া।...

সেই একজন, তখনই নিজের উটে সওয়ার হয়ে বসল এবং চলতে শুরু করল। উদ্দেশ্য মদীনা। এক সময় পৌঁছেও গেল।

তায়েফ থেকে মদীনা– প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটারেরও বেশি পথ। মদীনায় পৌঁছে লোকটি বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে, কোন দিকে যাবে। এক সময় মদীনার লোকদের জিজ্ঞেস করল– তোমাদের সেই লোকটি কোথায়, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন?

লোকেরা জানাল, তিনি মসজিদে আছেন। তুমি সেখানে যাও।

লোকটি আবার চলতে শুরু করল। যেতে যেতে এক সময় মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হল। দরজার কাছে নিজের উটটি বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করল। প্রবেশ করার পর ডানে-বামে তাকাতে লাগল। বুঝতে পারছে না কী করবে, কী বলবে। ক্ষণকাল পর উচ্চ আওয়াজে জিজ্ঞাসা করল– তোমাদের সেই লোকটি কোথায়, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন? কোথায় মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ?

সাহাবায়ে কেরাম তাকে বললেন, তুমি কি হেলান দিয়ে বসে থাকা শুভ্র-সুন্দর মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছ?

আগন্তুক বলল, হাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

সাহাবীগণ বললেন, তিনিই মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ।

আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করল, ইনিই কি নিজেকে নবী বলে মনে করেন?

সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, হাঁ; ইনিই।

আগন্তুক কাতার ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে নবীজীর কাছাকাছি চলে গেল।

এক সাহাবী বর্ণনা করেন, আমরা লোকটির আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না সে কী বলছে। আমরা তার দিকে ভালোভাবে তাকালাম। দেখলাম লোকটি একজন বেদুইন। তার মাথায় চুলের দু'টি ঝুঁটি রয়েছে। চুলগুলো লম্বা লম্বা। সে আরও এগিয়ে গেল এবং নবীজীর একেবারেই কাছাকাছি গিয়ে বসল। তারপর নবীজী ﷺ ও আশপাশে উপবিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকাতে লাগল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?

নবীজী ﷺ বললেন, এই যে আমি মুহাম্মাদ। বেদুইন জিজ্ঞাসা করল, আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যিনি নিজেকে নবী বলে বিশ্বাস করেন?

নবীজী বললেন, হাঁ।

আগন্তুক বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং বেশ কিছু বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করব। আপনি কিছু মনে করবেন না।

বেদুইন লোকটির কথার অর্থ হচ্ছে– আমি একজন বেদুইন। কথা বলার রীতি-নীতি আমার জানা নেই। কোনো বিষয় সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করার যোগ্যতাও আমার নেই। আমি এসব শিখিনি। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব সেভাবেই, যেভাবে আমি কথা বলি আমার কওমের বেদুইনদের সাথে।

নবীজী কোমলভাবে বললেন, তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞাসা কর।

আগন্তুক এবার তার প্রশ্ন শুরু করল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, হে মুহাম্মাদ! কে আকাশকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন?

নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ।

বেদুইন জিজ্ঞাসা করল, কে জমিনকে বিস্তৃত করেছেন?

নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ।

আগন্তুক আবারও জিজ্ঞাসা করল, কে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন?

নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ।

বেদুইন লোকটি এবার বলল, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আকাশসমূহ ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন, জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন, আল্লাহই কি আপনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

নবীজী ﷺ বললেন, হাঁ।

বেদুইন লোকটি বলল, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন আমাদেরকে মূর্তিপূজা ও সেসব শরিকদের ইবাদত থেকে নিষেধ করতে, যাদের ইবাদত করত আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষগণ? তিনিই কি আপনাকে এ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা দেব-দেবী ও অন্যান্য মাবুদদের পূজা-অর্চনা না করে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি?

নবীজী ﷺ বললেন, হাঁ।

বেদুইন লোকটি বলল, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ ﷻ-ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনি আমাদেরকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ করেন?

নবীজী ﷺ বললেন, হাঁ।

বেদুইন লোকটি বলল, আমি আপনাকে সেই সত্তার কসম দিয়ে বলছি, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ ﷻ-ই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আপনি আমাদেরকে রমযানের রোযা রাখতে ও

আমাদের সম্পদকে পবিত্র করতে [অর্থাৎ যাকাত আদায় করতে] আদেশ করেন?...

এভাবে আগন্তুক বেদুইন লোকটি নবীজী ﷺ-র সামনে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলির উল্লেখ করছিল আর নবীজী ﷺ 'হাঁ হাঁ' বলে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এক সময় তার কথা শেষ হল। অতঃপর বলল, আমি যিমাম ইবনে সা'লাবা। বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্রের একজন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন! আপনি আমাকে যা যা বললেন, আমি তাতে বৃদ্ধিও করব না, তা থেকে কমও করব না।

এ কথা শুনে নবীজী ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি সফলকাম।

এরপর লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘুরে নিজের উটের দিকে রওয়ানা হল। নবীজী ﷺ তাঁর দিকে ইশারা করে বললেন– 'দুই ঝুঁটিওয়ালা সফলকাম, যদি সে সত্য বলে থাকে।' [সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৬, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১১, ১২, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯২, ৩২৫২, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৪৫৭, ২০৮৯, ৫০৩৪]

বেদুইন লোকটি চলে গেলেন। তিনি নবীজী ﷺ-র দরবারে খুব বেশি সময় ছিলেন না। কেবল প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তার সমান্য এ সময়টুকুই নবীজী ﷺ-র দরবারে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু... প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন, নবীজীর মুখ থেকে শোনা এ কয়েকটি কথার প্রভাব ও ফলাফল কী হয়েছিল!

তিনি দরবার থেকে উঠে উটের কাছে গেলেন। উটের রশি খুলে সওয়ার হয়ে সোজা চলে গেলেন ওয়াদীয়ে নোমান-এ; নিজ সম্প্রদায়ে। টানা দশ দিন সফর করে তিনি মদীনায় এসে পৌঁছেছিলেন। পুনরায় দশ দিন সফর করে নিজ উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন।

আপন গৃহে প্রবেশ করার পর স্ত্রী তাঁকে দেখে খুশী হলেন। স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি আমার কাছে এসো না। আমার থেকে দূরে থাক। ধ্বংস হোক লাত! ধ্বংস হোক উজ্জা!

স্বামীর কথায় স্ত্রী হোঁচট খেলেন, আতঙ্কিত হলেন। সবিস্ময়ে বললেন, যিমাম! লাত-উজ্জার ব্যাপারে তুমি এসব কী বলছ! তুমি কুষ্ঠ রোগকে ভয় কর! তুমি পাগল হয়ে যাওয়াকে ভয় কর!

উল্লেখ্য, তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, যে কেউ লাত-উজ্জাকে গালি দিবে, সে এসকল রোগে আক্রান্ত হবে।

যিমাম ﵁ বললেন, আল্লাহর কসম! লাত-উজ্জার কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই। না তারা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে, না কারও কোনো উপকার সাধন করতে পারে। এ ক্ষমতা তাদের নেই।

কথাবার্তা ও আলোচনা চলছিল। এরই মাঝে যিমাম ﵁ তাঁর স্ত্রীকে বোঝাচ্ছিলেন। একত্ববাদ ও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন।

তারপর তিনি গেলেন পিতার কাছে। পিতাও ছেলেকে দেখে আনন্দিত হলেন। এগিয়ে এলেন সম্ভাষণ জানাতে। কিন্তু তিনি তেমনই বললেন– ধ্বংস হোক লাত! ধ্বংস হোক উজ্জা!

একথা শুনে পিতাও আঁতকে উঠলেন। বললেন, হে যিমাম! তুমি কুষ্ঠ রোগকে ভয় কর। তুমি পাগল হয়ে যাওয়াকে ভয় কর। লাত-উজ্জা তোমার প্রভু। তোমার বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের প্রভু।

যিমাম ﵁ বললেন, হে আমার পিতা! লাত-উজ্জা কারও কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করার কোনো ক্ষমতা রাখে না। সে ক্ষমতা তাদের নেই। বরং তাদের নিজেদেরই ভালো-মন্দের ক্ষমতা তাদের হাতে নেই।

এভাবে তিনি তাঁর পিতাকে বোঝাতে লাগলেন। একত্ববাদ ও ঈমানের দাওয়াত দিতে লাগলেন। এক সময় তার পিতাও ইসলাম কবুল করে নিলেন।

একইভাবে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন। সবাইকে মূর্তিপূজার অসারতা ও অন্তঃসারশূন্যতা বোঝাতে লাগলেন। বাতিল মাবুদদের নিষ্ফল পূজা পরিহার করে এক আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতে নিমগ্ন হতে বললেন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সেদিন সূর্যাস্তের সময় তাঁর সম্প্রদায়ে একজন কাফেরও অবশিষ্ট ছিল না। সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিয়েছিল।

প্রিয় পাঠক! বর্তমান যামানায় পাওয়া যাবে কি কোনো তাওবাকারীর মাঝে এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা! দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও ঈমানদারদের কল্যাণে এমন জযবা ও উদ্যমশীলত!

বহু তাওবাকারী তাওবার পূর্বে অপরাধ জগতে ছিল সর্দার, কিন্তু তাওবার পরে হয়ে গেছে নির্বিকার। আগে ছিল ঘোড়সওয়ার এখন হয়ে গেছে পায়ে হাঁটা পথিকা!

আশ্চর্য! জাহেলিয়্যাতে ছিল বীর এখন হয়ে গেছে ভীরু। ছিল তেজস্বী, হয়ে গেছে নিস্তেজ। ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো উপরকারই সে করতে পারে না।

– না দাওয়াতের ক্ষেত্রে।

– না ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধিতে।

– না মূর্খকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে।

– না গাফেলকে নসিহত করার ব্যাপারে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ﷻ-র আযমত ও বড়ত্বকে যে অন্তরে বসাতে পেরেছে, সে কড়াভাবে নিজের নফসের হিসাব নিতে পারে। নিজেকে কঠোরভাবে যাচাই করতে পারে।

উপমা : ১

খলীফাতুর রাসূল আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-র একটি গোলাম ছিল। গোলাম প্রতিদিন কাজের সন্ধানে বের হত। দিন শেষে গোলাম কিছু না কিছু মাল বা খাবার মনিবের জন্য নিয়ে আসত। সে কোনোদিন বাজারে গিয়ে কুলির কাজ করত; কোনোদিন মানুষের মজুর খাটত; কোনোদিন নির্মাণকাজ করত। এভাবে একেকদিন একেক কাজে বের হত। প্রতিদিনই সে দিন শেষে কিছু না কিছু মনিবের জন্য নিয়ে আসত।

গোলাম প্রতিদিন যা-ই নিয়ে আসত, আবু বকর ﷺ প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আজ কী কাজ করেছ? গোলাম কোনোদিন উত্তর দিত– আজ কুলির কাজ করেছি; কোনোদিন উত্তর দিত– আজ নির্মাণ কাজ করেছি। ইত্যাদি... গোলামের জওয়াব শুনে আবু বকর ﷺ আশ্বস্ত হতেন। অতঃপর সেই খাবার খেতেন বা মাল গ্রহণ করতেন।

কিন্তু একদিন গোলাম কোথাও থেকে তাঁর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলে যাচাই করা ছাড়াই তিনি বিসমিল্লাহ বলে এক লোকমা মুখে তুলে নিলেন। কারণ, তিনি সেদিন খুবই ক্ষুধার্ত ছিলেন।

এ দেখে গোলাম বলল, আবু বকর! আপনি তো প্রতিদিন খাবার নিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করেন– এ খাবার আমি কোত্থেকে এনেছি। কিন্তু আজকে তো তেমন কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না?

আবু বকর ﷺ বললেন, ঠিকই তো! প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকে বে-খেয়াল করে দিয়েছে। তুমি এ খাবার কোত্থেকে এনেছ?

গোলাম বলল, জাহেলী যামানায় একবার আমি এক কওমের জন্য গণকের[১] কাজ করেছিলাম। তবে আমি তা ভালো পারতাম না।

---

[১] অর্থাৎ যাহেলী যামানায় আমি একবার এক কওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কওমের লোকেরা আমাকে বলল, আমাদের ভাগ্য গণনা করে দাও। তাদের কথায় আমি মাটিতে কিছু দাগ কাটতে থাকলাম এবং আকাশের দিকে তাকাতে লাগলাম। অতঃপর বললাম, তোমাদের এমন হবে, তেমন হবে... ইত্যাদি।=

কিন্তু সেদিন তারা আমাকে কোনো পারিশ্রমিক দেয়নি। আজ আমি আবার তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তাদের ওখানে ওলীমার অনুষ্ঠান হচ্ছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম– আমি তোমাদের কাছে আমার পারিশ্রমিক চাইতে এসেছি।

আমার দাবি শুনে তারা বলল, ঠিক আছে আমাদের খাবার থেকে তোমার পারিশ্রমিক নিয়ে যাও। আবু বকর! আপনার সামনের এই খাবার তাদের দেওয়া সেই খাবার।

আবু বকর ﵁ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন– নাউযুবিল্লাহ! আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে গণনার পারিশ্রমিকের খাবার খাওয়াচ্ছ?! তুমি আমাকে মন্ত্র-তন্ত্র ও ভোজবাজির খাবার খাওয়াচ্ছ?! আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

তারপর তিনি গলার ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে পেটের ভিতর থেকে সেই খাবার বের করে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

লোকেরা বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন! এক লোকমা খাবার আর তেমন কী? এর জন্য আপনি এত কষ্ট করছেন কেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এই লোকমা পেট থেকে বের করার আগ পর্যন্ত আমি দাঁড়াব না, বসব না, ঘুমাব না।

লোকেরা বলল, এই এক লোকমা খাবার আপনি এত সহজে বের করতে পারবেন না। তবে যদি অধিক পরিমাণে পানি পান করেন, তা হলে হয়তো পারবেন।

আবু বকর ﵁ বললেন, তোমরা আমার জন্য পানি নিয়ে এসো।

লোকেরা তা-ই করল। তাঁর জন্য গরম পানি নিয়ে এল। অতঃপর তিনি তা পান করতে শুরু করলেন এবং বমি করতে চেষ্টা করতে

=আমি তাদের মিথ্যা বলেছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে বলতে পারছিল না যে, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, বিষয়গুলো ছিল সবই অদৃশ্যের ব্যাপার। তা ছাড়া আমার কথা সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করার মতো কোনো মাপকাঠিও তাদের ছিল না।]

লাগলেন। যতক্ষণ না বমি করে পেট থেকে সবকিছু বের করতে সক্ষম হলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালিয়েই গেলেন।

তারপর লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, খলীফাতুল মুসলিমীন! এই একটি লোকমার জন্য কেন আপনি এত কষ্ট করলেন?

তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন—

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ.

> যে শরীর হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট, তার জন্য জাহান্নামই অধিকতর উপযুক্ত। [হিলয়াতুল আউলিয়া— ১/৩১]

শরীরের যে গোশত হারাম খাদ্য থেকে উৎপন্ন হবে, তা জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। বরং তার জন্য জাহান্নামই অধিকতর উপযুক্ত। তাই আমি ভয় করছি, আমি যে লোকমাটি খেয়ে ফেলেছি, তা থেকে না আবার আমার শরীরে কোনো অংশ উৎপন্ন হয়ে যায়!

আশ্চর্য : আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه যিনি খলীফাতুর রাসূল; খলীফাতুল মুসলিমীন; নবীজীর পর উম্মতের সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তি, তিনিই যদি এক লোকমা খাবারের জন্য এত কষ্ট করেন, তা হলে সেসব লোকের ব্যাপারে মূল্যায়ন ও মন্তব্য কী হতে পারে, যারা নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে—

— হারাম ভক্ষণ করে!

— মদ পান করে!

— অন্যান্য নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে?!

আরও লক্ষ করুন, খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه কতটা সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বীয় নফসের হিসাব নিতেন।

উপমা : ২

শাম অঞ্চলে নিযুক্ত উমর رضي الله عنه-র গভর্নর তাঁর কাছে কয়েক মশক তেল পাঠিয়েছেন, যেন সেগুলো বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বাইতুল

মাল'-এ জমা করে নেওয়া হয়। উমর ﵁ সে তেল মেপে মেপে মানুষের পাত্রে দিতে শুরু করলেন। যখন এক মশক শেষ হয়ে যেত, তখন তিনি সেটিকে উল্টিয়ে সম্পূর্ণরূপে নিংড়ে পাশে রেখে দিতেন।

পাশেই ছিল তাঁর এক ছোট ছেলে। যখনই তিনি কোনো খালি মশক পাশে রাখতেন, তখন তাঁর ছোট ছেলে ওই মশকটি নিজের মাথার উপর উল্টে ধরত। মশক থেকে এক/দুই ফোঁটা তেল তার মাথায় পড়ত। এভাবে সে চার/পাঁচ মশক থেকে নিংড়ে কয়েক ফোঁটা তেল মাথায় মাখল।

বিষয়টি এতক্ষণ উমর ﵁-র নজরে পড়েনি। তিনি হঠাৎ ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখেন তার মাথার চুল সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মাথায় তেল মেখেছ?

ছেলে জওয়াব দিল, হাঁ।

উমর ﵁ জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে?

ছেলে জওয়াব দিল, এই মশকগুলো থেকে এক/দুই ফোঁটা করে নিংড়ে নিংড়ে।

জওয়াব শুনে উমর ﵁ বললেন, তোমার চুল মুসলিম জনগণের তেল দ্বারা সজ্জিত হয়েছে, পুষ্ট হচ্ছে, কোনো বিনিময় ছাড়াই। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এ বলে উমর ﵁ ছেলেকে ধরে নাপিতের কাছে নিয়ে গেলেন এবং মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে দিলেন, মুসলিম জনসাধারণের এক/দুই ফোঁটা তেলের ভয়ে।

এই হল আল্লাহওয়ালা ও মুত্তাকীদের অবস্থা। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, কেবল প্রবৃত্তিপূজাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্ম, দুনিয়া-আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার জীবন হয়তো কোনোভাবে কেটে যাবে, কিন্তু মৃত্যুর সময় যারপরনাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে, কিন্তু তখনকার সেই লজ্জা ও অনুতাপ কোনোই কাজে আসবে না। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾.

যদি আপনি দেখেন, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। [সূরা আনআম : ৯৩]

সময় থাকতে তাওবা করে নিন

এক ডাক্তার আমাকে ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, একবার হাসপাতালের আই.সি.ইউ-র রুমে প্রবেশ করেই আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় পঁচিশ বছরের এক যুবকের দিকে। যুবক মরণব্যাধি এইডস-এ আক্রান্ত। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

আমি কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। সে অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলল কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আমি ফোনে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কিছুক্ষণ পর তার মা হাসপাতালে আসেন।

তার মা এলে আমি তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

মা জওয়াবে বললেন, 'ওই মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সে ভালোই ছিল।'

আমি সেদিকে না গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি সালাত পড়ত?

মা বললেন, না; তবে সে ইচ্ছা করেছিল জীবনের শেষ দিকে যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করে নেবে এবং হজ করবে।

যা হোক, আমি আবার যুবকের কাছে গেলাম। ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছে। তার মৃত্যুযন্ত্রণা প্রায় শুরু হয়ে গেছে। আমি তার আরও কাছে গেলাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে কোমল স্বরে বললাম, বলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আমার কণ্ঠ শুনে সে কিছুটা চেতনা ফিরে পেল। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে লাগল। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে তার চেহারা কালো হয়ে যেতে লাগল। আমি বরাবরই বলে যাচ্ছিলাম, বলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

এবার সে অস্ফুট কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বলতে লাগল, আহ ব্যথা! ব্যথা! প্রচণ্ড ব্যথা! ব্যথা কমার ওষুধ দিন! আহ! আহ!

যুবকের অবস্থা দেখে আমার কান্না এসে গেল। আমি অশ্রু সংবরণ করার চেষ্টা করছি আর বলে যাচ্ছি, বলো– লা ইলাহা ইল্লাহ।

সে অনেক কষ্টে আবার তার ঠোঁট দু'টো নাড়াতে শুরু করল। আমি খুশি হলাম। ভাবলাম, এখনই হয়তো সে কালিমা পাঠ করবে। কিন্তু না; সে বলতে লাগল– না; আমি পারছি না; আমি বলতে পারছি না; আমি আমার বান্ধবীকে চাই; আমি বলতে পারছি না।

যুবকের মা অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি কাঁদছেন। চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছে, অঝোর ধারায়।

এদিকে যুবকের হৃদস্পন্দন কমতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। এ সময় আমি আর আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। আমি শব্দ করে কেঁদে ফেললাম।

আবারও আমি তার হাত ধরে চেষ্টা করতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, বলো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! বলো! কিন্তু সে আগের মতোই বলতে লাগল– আমি পারছি না; আমি বলতে পারছি না। এর পর পরই সে হেঁচকি দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হৃদস্পন্দন সম্পূর্ণরূপে

বন্ধ হয়ে গেল এবং তার চেহারা কালো হয়ে গেল। যুবক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

যুবকের মা কান্নায় ভেঙ্গো পড়লেন। তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু–

– মায়ের এ কান্না তার কী উপকার করবে?

– এ বিলাপ ও আহাজারি তার কী-ই বা কল্যাণ সাধন করবে?

হাঁ, প্রিয় পাঠক!

– যুবক তার রবের কাছে চলে গেছে।

– তার খাহেশাত ও প্রবৃত্তি তার কোনো উপকারে আসেনি।

– দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ, সুখ-উপভোগ তার কোনো কাজে আসেনি।

কারণ–

– সে তার যৌবনের ধোঁকায় পড়ে ছিল।

– গাড়ি-বাড়ি ও পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যে প্রতারিত হয়েছিল।

– সে তার রবকে ভুলে গিয়েছিল।

– আখেরাত ও হিসাব-নিকাশের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

আজ কবরে তাকে তার আমলের হিসাব দিতে হবে। তার যাবতীয় কৃতকর্ম তাকে ঘিরে রাখবে।

﴿فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾

অতএব, তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের কাজে এল না। [সূরা হিজর : ৮৪]

অন্যরকম একটি মৃত্যু

প্রিয় পাঠক!

এই যুবকের অবস্থা সেই যুবকের সাথে তুলনা করে দেখুন, যার বয়স হয়েছিল ষোল বছর। সে মসজিদে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল আর ফজর সালাতের ইকামতের অপেক্ষা করছিল।

সময়মতো ফজরের ইকামত হল। যুবক উঠে হাতের কুরআন শরীফটি যথাস্থানে রাখল। জামাতে শরিক হওয়ার জন্য অগ্রসর হল। ঠিক তখন সে মাথা ঘুড়িয়ে জমিনে পড়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে গেল। মসজিদের কয়েকজন মুসল্লী তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

তাকে চিকিৎসা প্রদানকারী ডাক্তার পরবর্তীতে বলেছেন, এ যুবককে আমাদের কাছে আনা হয়েছিল জানাযার মতো বহন করে। আমি তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখলাম সে হার্টঅ্যাটাক করেছে। আরও গভীরভাবে লক্ষ করে দেখলাম, সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছে। আমরা দ্রুত তার চিকিৎসায় রত হলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম তার হার্টের উন্নতির জন্য।

পাশের রুম থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনার জন্য আমি আমার এক সহকর্মীকে তার পাশে রেখে গেলাম। আমি দ্রুতই ফিরে এলাম। ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি যুবক আমার সহকর্মী ডাক্তারের হাত ধরে রেখেছেন। ডাক্তার তার কান যুবকের মুখের কাছে নিয়ে রেখেছেন। যুবক কানে কানে তাকে কিছু বলছে। এ অবস্থা দেখে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম না। দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ যুবক ডাক্তারের হাত ছেড়ে দিল। এখন সে সর্বশক্তি দিয়ে ডান কাতে ঘোরার চেষ্টা করছে। অতঃপর ভারী কণ্ঠে উচ্চারণ করল– 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। এ কালিমাটি সে বারবার পড়ছিল। ধীরে ধীরে তার হৃদস্পন্দন কমে যেতে লাগল। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র ফায়সালা আমাদের চেষ্টার উপর কার্যকর হল। যুবক তার রবের কাছে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকর্মী ডাক্তারটি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি এত বেশি কাঁদতে লাগলেন যে, পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। বসে পড়লেন।

এ ঘটনা দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাকে বললাম, হে অমুক! আপনার কী হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন? মৃত্যুর ঘটনা তো আপনি জীবনে এই প্রথম দেখছেন না! কত মানুষের মৃত্যুই তো হল আপনার চোখের সামনে।

তিনি আমাদের কথা কানে নিলেন কি না জানি না। তিনি তেমনই কেঁদে যেতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর...

তার কান্নার বেগ কিছুটা কমে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কী হয়েছে? যুবক আপনাকে কী বলেছিল?

তিনি বললেন, ডাক্তার! যুবক যখন দেখল আপনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে একবার রুম থেকে বের হচ্ছেন আবার প্রবেশ করছেন, চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম জোগাড় করছেন, তখন সে বুঝতে পারল, আপনিই তার জন্য নিয়োজিত ডাক্তার। তাই সে আমাকে বলল– ডাক্তার! আপনি আপনার সহকর্মীকে বলুন, তিনি যেন আমার জন্য শুধু শুধু কষ্ট না করেন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাব। আল্লাহর কসম! আমি জান্নাতে আমার স্থান দেখতে পাচ্ছি।

– আল্লাহু আকবার!

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবি কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। [সূরা হা-মীম সেজদাহ : ৩০-৩২]

আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে পুণ্যময় মৃত্যু দান করেন।

হাঁ, প্রিয় পাঠক! এই হচ্ছে অনুগত ও অবাধ্য বান্দার পার্থক্য। প্রকৃত পার্থক্য তো ফুটে উঠবে সেদিন–

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾

যেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল; এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধুলি ধূসরিত। সেগুলোকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল। [সূরা আবাসা : ৩৪-৪২]

তবে যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং নিজেকে খাহেশাতে নফসানী ও প্রবৃত্তিপূজা থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ

কর্তৃক হারামকৃত যাবতীয় বিষয়াশয় থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালক অঙ্গীকার করেছেন এমন জান্নাতের, যার তলদেশে থাকবে প্রবাহিত নহরসমূহ।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'দুনিয়ার সর্বাধিক স্বচ্ছল ও ধন-সম্পদের অধিকারী এক জাহান্নামীকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার অবগাহন করিয়ে বলা হবে, হে আদম সন্তান! দুনিয়াতে তুমি কখনও আরাম-আয়েশ ভোগ করেছ কি? কখনও তুমি স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেছ কি?

সে বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমার রব! না; কক্ষনো না।'

হাঁ, যে ব্যক্তি দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশে ডুবে ছিল, সব ধরনের নেয়ামত ভোগ করেছিল, জাহান্নামের আগুনে একটি মাত্র ডুব তাকে সে সবকিছু ভুলিয়ে দিবে। তা হলে তখন তার অবস্থা কী হবে, যখন তাকে–

– সেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে!

– প্রতিনিয়ত শাস্তি ও আযাব অসহ্য যন্ত্রণা দিতে থাকবে!

– যাক্কুম খেতে হবে!

– ফুটন্ত পানি ও রক্ত-পুঁজ পান করতে হবে!

– কী অবস্থা হবে তখন তার, যখন তার সাহায্যপ্রার্থনার জওয়াবে বলা হবে–

﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না। [সূরা মুমিনুন : ১০৮]

আল্লাহর কসম! তার কি তখন মনে হবে–

– সেই অশ্লীলতার কথা, যাতে সে লিপ্ত হয়েছিল?

– সেই গানবাদ্যের কথা, যা সে শুনেছিল?

– সেই মদ ও নেশার কথা, যা সে পান করেছিল?

– সেই ধন-দৌলত ও সম্পদের কথা, যা সে উপার্জন করেছিল?

তখন তাকে বলা হবে–

﴿اِصۡلَوۡهَا فَاصۡبِرُوۡۤا اَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡا ۚ سَوَآءٌ عَلَیۡکُمۡ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ﴾

এতে [জাহান্নামে] প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। [সূরা তূর : ১৬]

অতঃপর নবীজী ﷺ বলেছেন–

'এরপর দুনিয়ার সর্বাধিক দুরাবস্থাসম্পন্ন এক জান্নাতীকে উপস্থিত করা হবে। তারপর তাকে একবার জান্নাতে অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! দুনিয়াতে তুমি কখনও কোনো কষ্টে দিনাতিপাত করেছ কি? কোনো হৃদয়বিদারক ও ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ কি?

সে বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমার রব! আমি কখনোই কোনো কষ্টে দিনাতিপাত করিনি। দুঃখ কী জিনিস, আমি কখনও তা দেখিইনি।'

হ্যাঁ, জান্নাতে ক্ষণিকের অবস্থান তাকে তার দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ ভুলিয়ে দিবে। তা হলে তখন তার অবস্থা কেমন হবে, যখন সে–

– জান্নাতের নহর থেকে দুধ পান করবে!

– হুরদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থাকবে!

– জান্নাতের আলিশান বালাখানায় বসবাস করবে!

– নবী-রাসূলগণের মজলিসে আসা-যাওয়া করবে!

বরং তখন তার অবস্থা কেমন হবে, যখন তার রব তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং বলবেন– 'হে জান্নাতবাসীগণ!

তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' অতঃপর তারাও তাদের মহামহিয়ান রবের চেহারার দিকে তাকাবে?
আল্লাহর কসম! তখন কি তার মনে হবে–

– সেই দুঃখ-কষ্টের কথা, যা সে দুনিয়াতে ভোগ করেছিল!

– সেই সংযমের কথা, যা তাকে ভোগ-উপভোগ ও বিলাসিতা থেকে বিরত রেখেছিল!

– না; কখনোই না। বরং সে থাকবে চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশে। যেখানে যৌবন কখনও ফুরাবে না; কোনো জিনিসের স্বাদ ও আনন্দে কখনও কোনো ঘাটতি আসবে না। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

> তারা তথায় যা চাইবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। [সূরা ক্ব-ফ : ৩৫]

হাঁ, আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও অধিক, আরও বেশি। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيْرَةَ أَلْفَ سَنَةٍ.
>
> একজন সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতীর বাগান, স্ত্রী, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী, খাদেম এবং খাট-পালঙ্ক ও আসনসমূহ কেউ দেখতে চাইলে তা তার জন্য হাজার বছরের পথ। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৫৩]

আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে খাঁটি দিলে খাঁটি তাওবা করার এবং সব বিষয়ে সর্বদা তাঁর অভিমুখী হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

পরিশেষে তাওবার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। যথা–

প্রথম বিষয়

যে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব, তার তালিকা ও ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ এবং সেগুলোর স্তর ও মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন। তবে এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ কতগুলোর কথা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

যে সকল গুনাহ থেকে খাঁটি দিলে তাওবা করা আবশ্যক, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ হচ্ছে শিরক– আল্লাহ ﷻ-র সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা। শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا﴾

> তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না। [সূরা নিসা : ৩৬]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ﴾

> তোমার রব চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩]

শিরক করা, কাউকে আল্লাহ ﷻ-র সঙ্গে শরিক করা যে কোনো বিচারে সবচেয়ে বড় হারাম ও মহাপাপ। যেমন, আবু বাকরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ...

> আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? নবীজী এ কথাটি তিন বার বলেছেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৫৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯]

শিরক ব্যতীত অন্য যে কোনো গুনাহ আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না। তবে

শিরকের প্রতিকার করতে চাইলে খাঁটি দিলে আল্লাহ ﷻ-র দরবারে তাওবা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

> নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া যত গুনাহ আছে তা তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। [সূরা নিসা : ৪৮]

শিরকের অনেক প্রকার ও ধরন রয়েছে। যেমন–

গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা

অনেকে নিজের প্রয়োজনপূরণ, বিপদাপদ দূরকরণ, মনোবাঞ্ছাপূরণ, সন্তানাদি লাভ ইত্যাদির জন্য গাইরুল্লাহকে আহ্বান করে; কবরে বা মাজারে শায়িত ব্যক্তি কিংবা মৃত অলী-আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে হাত পাতে। তাদের বিশ্বাস– তারা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারেন, বিপদাপদ দূর করেন, সন্তানাদি দান করেন, ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ﴾

> তাদের থেকে অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকে, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্তও তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। অধিকন্তু তারা তাদের ডাকাডাকি সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না। যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে। [সূরা আহকাফ : ৫-৬]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

> আল্লাহ ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা তোমাদেরই মতো বান্দা ও দাস। [সূরা আ'রাফ : ১৯৪]

গাইরুল্লাহর নামে কসম করা

গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা জায়েয নেই। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাইরুল্লাহর নামে কসম করে থাকে। কসম মূলত এক প্রকার সম্মান, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পাওয়ার যোগ্য নয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.
>
> সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কারও যদি কসম করতেই হয়, তবে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে নতুবা চুপ থাকে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০৮]

ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন–

> مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.
>
> যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম করল, সে শিরক করল। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫৩, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫৩৭৫]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.
>
> যে আমানত এর নামে কসম করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৫৩]

অতএব, কাবা, আমানত, মর্যাদা, সাহায্য, অমুকের বরকত, অমুকের জীবন, নবীর মর্যাদা, অলীর মর্যাদা, পিতা-মাতা বা সন্তানের মাথা ইত্যাদির নামে কসম করা জায়েয নেই। কেউ যদি আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করেই ফেলে, তা হলে তার কাফফারা ও

প্রতিকার হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

> যে ব্যক্তি লাত-উজ্জার নামে কসম করবে, সে যেন [সঙ্গো সঙ্গোই] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' [আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই– এই কালিমা] পড়ে নেয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৬০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯৭]

জাদু, ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী

জাদু অনেক বড় কবীরা গুনাহ। এ জাদু কখনও কখনও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। জাদু সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের একটি। জাদু শুধু ক্ষতিই করে, কোনো উপকার করে না। জাদু শিক্ষা করা প্রসঙ্গো আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾

> তারা এমন জিনিস [জাদু] শিক্ষা করে, যা তাদের অপকারই করে, কোনো উপকার করে না। [সূরা বাকারা : ১০২]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾

> জাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন, সে সফলকাম হবে না। [সূরা ত্ব-হা : ৬৯]

নিজে জাদু চর্চা করা, কারও জন্য জাদু করানো, জাদুকরের কাছে যাওয়া– এ সবই হারাম। যেমন, এক হাদীসে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

> যে ব্যক্তি গণক কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তা অস্বীকার করে। [মুসনাদে আহমাদ : ২/৪২৯, হাদীস নং ৯৫৩২]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

> যে ব্যক্তি কোনো ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩০]

যারা ভাগ্য গণনা করে, ভবিষ্যতের খবর জানে বলে দাবি করে, তারাও হারামে লিপ্ত। একমাত্র আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানে না।

একই কথা প্রযোজ্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রাশিফলে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারেও। যারা গায়েব জানে বলে দাবি করে, তাদের কাছে যাওয়া, তাদেরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা, কিংবা ফোনে তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু জানতে চাওয়া– এ সবই হারাম।

এ ছাড়াও আরো এমন বহু বড় বড় কবীরা গুনাহ রয়েছে, যা থেকে খাঁটি দিলে তাওবা করা অপরিহার্য। যেমন–

যিনা-ব্যভিচার

শিরক ও মানুষ হত্যার পর সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে যিনা-ব্যভিচার। যিনা-ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে হারাম। মারাত্মক কবীরা গুনাহ।

শরীয়ত পর্দা ফরয করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে এবং গায়রে মাহরাম স্ত্রীলোকদের সঙ্গো নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, এ ছাড়াও এ ধরনের আরও বিভিন্ন বিধি-বিধান ও নীতিমালা আরোপ করে শরীয়ত ব্যভিচার ও ব্যভিচারের যাবতীয় উপায়-অনুষঙ্গোর পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ ﷻ কেবল যিনা করতেই নিষেধ করেননি, বরং যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। [সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২]

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের বর্তমান যুগে অশ্লীলতার সকল দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে। শয়তান ও তার দোসরদের চক্রান্তে অশ্লীলতার যাবতীয় পথ-পন্থা ও উপায়-উপকরণ সহজলভ্য হয়ে গেছে। পাপী ব্যভিচারীরা এখন খোলাখুলি শয়তানের অনুসরণ করছে। মেয়েরা বেপর্দা হয়ে ব্যাপকভাবে বাইরে বের হচ্ছে। যেকোনো বয়সের যেকোনো মেয়ে বিনা বাধায় দ্বিধাহীনচিত্তে যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাতায়াত করছে। উগ্রভাবে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে। অবাধ মেলামেশা, পর্ণোগ্রাফি ও ব্লু-ফিল্মে দেশ ভরে গেছে। কে কত বেশি খোলামেলা হতে পারে যেন তার প্রতিযোগিতা চলছে। ধর্ষণ ও বলাৎকারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে দয়া, অনুগ্রহ ও গোপনীয়তা প্রার্থনা করছি এবং এমন সম্ভ্রম কামনা করছি, যার বদৌলতে তুমি আমাদেরকে সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করবে। আমরা তোমার কাছে আমাদের মনের পবিত্রতা ও ইযযতের হেফাজত প্রার্থনা করছি। দয়া করে তুমি আমাদের মাঝে ও হারামের মাঝে একটি সুদৃঢ় আড়াল ও প্রাচীর তৈরি করে দাও। আমীন!

সুদ, ঘুষ ও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করা :

সুদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর– যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোন। [সূরা বাকারা : ২৭৮-২৭৯]

একমাত্র সুদখোর ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। আল্লাহ ﷻ-র কাছে সুদ খাওয়া যে কত মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ, তা বোঝার জন্য উক্ত আয়াতদ্বয়ই যথেষ্ট।

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.

যারা সুদ খায় তারা [কেয়ামতের দিন] এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। [সূরা বাকারা : ২৭৫]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং তার সাক্ষীদ্বয়কে লানত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১৭৭]

অপর এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرُهَا مِثْلُ اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ وَإِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

সুদের তিয়াত্তরটি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সহজতর স্তর হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের সমতুল্য। আর সবচেয়ে কঠিনতম স্তর হল মুসলিম ব্যক্তির মানহানি। [আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, হাদীস নং ২২৫৯]

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً.

কোনো লোক জেনেশুনে সুদের এক দিরহাম ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার ব্যভিচার করা থেকেও কঠিন। [মুসনাদে আহমাদ : ৫/২২৫]

অতএব–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর– যদি তোমরা ঈমানদার হও। [সূরা বাকারা : ২৭৮]

মদপান ও নেশাদ্রব্য গ্রহণ

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং, তোমরা তা থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা মায়িদা : ৯০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

যে ব্যক্তি মদপান করে, তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তিনি তাকে ‘তীনাতুল খাবাল’ পান করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘তীনাতুল খাবাল’ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ-রক্ত। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৩৫]

অপর এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন–

مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

যে ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্থ অবস্থায় মারা গেল, সে মূর্তিপূজারীর ন্যায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। [হিলয়াতুল আউলিয়া– ৯/২৫৩]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

যে ব্যক্তি মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয়, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সে জাহান্নামে যাবে। আর যদি সে তাওবা করে নেয়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় যদি সে মদ পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। যদি সে ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পুনরায় যদি সে মদ পান করে, তা হলে কেয়ামতের দিন তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' পান করানো আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'রাদগাতুল খাবাল' কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৭৭]

বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বেরিয়েছে। সেগুলোর নামও বিভিন্ন রকম। আরবী-আজমী সব রকমই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বিয়ার, হুইস্কি, ভদকা, শ্যাম্পেন, কোডিন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, হেরোইন, ইত্যাদি। অনেকে বলতে চায়, এগুলো কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মদ নয়। সুতরাং, এগুলো খাওয়াও হারাম নয়। মনে

রাখবেন, নাম ও লেভেল যাই হোক, সবগুলো একই জিনিস এবং তার হুকুমও জানা। অর্থাৎ তা স্পষ্ট হারাম। এদের ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন–

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু লোক মদ পান করবে, তারা সেটাকে ভিন্ন নামে নামকরণ করবে। [মুসনাদে আহমাদ : ৫/৩৪২]

গানবাদ্য শোনা

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ﴾

মানুষের মাঝে কেউ কেউ এমন আছে, যে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার জন্য অসার কথা খরিদ করে। [সূরা লুকমান : ৬]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه আল্লাহর কসম করে বলতেন, উক্ত আয়াতে 'অসার কথা' বলে গানকে বোঝানো হয়েছে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৬/৩৩৩]

আবু আমের ও আবু মালেক আল আশআরী رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম ব্যবহার, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল গণ্য করবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০]

অপর এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَيَكُونَنَّ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

অবশ্যই এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধস, শারীরিক অবয়ব বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শাস্তি নিপতিত হবে। তখন মুসলমানদের মধ্যে

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কবে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এসব তখনই ঘটবে, যখন তারা মদপান শুরু করবে, গায়িকা রাখবে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। [আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং ২২০৩, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২১২]

আপদের উপর আপদ হচ্ছে, গানবাদ্য ও মিউজিকের এ সর্বগ্রাসী থাবা এখন শুধু গানের মধ্যেই সীমাবন্ধ নেই; বরং তা ঘড়ি, ঘণ্টা, শিশুখেলনা, কম্পিউটার, টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি সামগ্রীর মাঝেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং তা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে। মনের দৃঢ় সংকল্প না থাকলে এসব থেকে বেঁচে থাকা বড়ই মুশকিল, বড়ই দুষ্কর। একমাত্র আল্লাহ ﷻ-ই সাহায্যস্থল।

প্রিয় পাঠক!

এখানে নমুনা ও উদাহরণস্বরূপ কিছু কবীরা গুনাহের আলোচনা করা হল। এগুলো ছাড়াও আরও বহু কবীরা গুনাহ আছে, যেগুলো পরিহার করা ও যেগুলো থেকে খাঁটি দিলে তাওবা করা একান্ত অপরিহার্য। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, এ ব্যাপারে যথাসাধ্য অন্যকে উপদেশ-নসিহত করা। আল্লাহ ﷻ আমাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে। [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

দ্বিতীয় বিষয়

কোনো কোনো মানুষ যখন কোনো গুনাহ থেকে তাওবা করতে চায়, তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যখন গানবাদ্য শোনা থেকে তাওবা করতে চায়, তখন শয়তান তাকে এ বলে ধোঁকা দেয়– 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সিগারেট খাবে, সালাতে অলসতা করবে

ইত্যাদি আরও গুনাহে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গানবাদ্য শোনা থেকে তোমার তাওবা কবুল হবে না। হয়তো তুমি এই সব গুনাহ থেকে একসঙ্গে তাওবা করবে, নয়তো তোমার কোনো তাওবাই কবুল হবে না। অতএব, শুধু শুধু তোমার নফসকে কষ্ট দিয়ো না।'

এটা ভুল কথা। কেননা, প্রত্যেক গুনাহের তাওবা আলাদা। এটা খুবই সম্ভব যে, কেউ অন্য কোনো গুনাহে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তার যিনা-ব্যভিচারের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। তবে এটা ঠিক যে, বান্দার উচিত সমস্ত গুনাহ থেকেই তাওবা করে নেওয়া।

একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার আমরা একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য লোকজনকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছিলাম। লোকজন যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করেছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এক যুবক আমাদের কাছে এল। সে সিগারেট খেত; আরও বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত হত।

যুবক আমাদের কাছে এসে মুখবন্ধ একটি পাত্র আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। খুলে দেখলাম তাতে পাঁচ হাজার রিয়াল আছে। আমি কিছুটা কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এগুলো কোত্থেকে এনেছ?

সে উত্তর দিল, আমি আমার মা, ভাই ও কিছু নিকটাত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তাদের কাছ থেকেই এগুলো সংগ্রহ করেছি। শায়খ! আপনি এগুলো রাখুন; মসজিদের কাজে ব্যয় করবেন।

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন! ওই মসজিদে যত মুসল্লী সালাত আদায় করবেন, যত তাসবীহ পাঠকারী তাসবীহ পাঠ করবেন, যত যিকিরকারী যিকির করবেন, যত তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত করবেন, তার সমপরিমাণ সাওয়াব কি ওই যুবকের আমলনামায়ও লেখা হবে না?

– হবে। অবশ্যই হবে। কারণ, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজের প্রতি আহ্বান করবে, তার আমলনামায় সেসকল লোকের সমপরিমাণ সাওয়াব লেখা হবে, যারা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমল করবে; আমলকারীদের

> সাওয়াবে বিন্দুমাত্রও কমতি করা ছাড়াই। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৪, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, হাদীস নং ৫০৭, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২০৬, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৯]

কেন নয়?! অবশ্যই!

যেহেতু আমাদের আলোচিত যুবক তার সম্পদ এই মসজিদে দান করেছে, সেহেতু কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে তার সাওয়াব পেতে থাকবে– যদি তার নিয়ত ভালো থেকে থাকে।

কিন্তু প্রিয় পাঠক! আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে– ওই যুবক মসজিদের জন্য টাকা সংগ্রহ করার সময় যদি শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে বলত– 'আরে তুমি মসজিদের জন্য টাকা সংগ্রহ করছ! অথচ তুমি একজন গুনাহগার; তুমি সিগারেট খাও; গান শোন; দাড়ি মুণ্ডন কর', আর ওই যুবকও যদি ধোঁকা খেয়ে বলত– 'হাঁ, তাই তো! আমি তো গান শুনি; দাড়ি মুণ্ডন করি; আরও বিভিন্ন গুনাহের কাজ করি, এমতাবস্থায় আমি কী করে মসজিদ নির্মাণ করি? কিংবা মসজিদ নির্মাণের কাজে সাহায্য করি?! না, এটা করা যায় না। যখন আমি সিগারেট খাওয়া থেকে তাওবা করব; অমুক অমুক গুনাহ থেকে তাওবা করব, তখন আমি মসজিদ নির্মাণের জন্য সাহায্য করব', তা হলে সুনিশ্চিত শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়ে যেত এবং সে মস্ত বড় কল্যাণ ও সাওয়াব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যেত। কিন্তু ওই যুবক ভাগ্যবান। সে তার নফসের উপর বিজয় লাভ করতে পেরেছে।

তা ছাড়া আরও একটি বিষয় জেনে রাখবেন, কোনো গুনাহ থেকে তাওবা করার পর পুনরায় সেই গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, পূর্বের তাওবা বাতিল হয়ে গেছে, ফলে বান্দা নিরাশ হয়ে যাবে এবং পুনরায় গুনাহের রাজ্যে ফিরে যাবে। না; বরং আবারও এবং দ্রুত তাওবা করে নেবে। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾
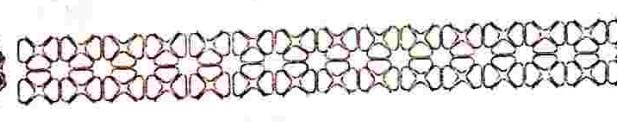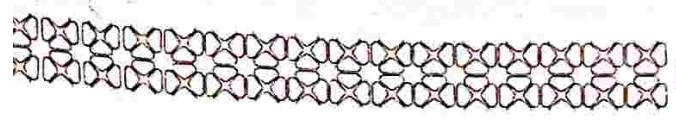
এবং যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তা-ই করতে থাকে না। [সূরা আলে ইমরান : ১৩৫]

তৃতীয় বিষয়

তাওবার মোট শর্ত পাঁচটি। যথা–

১. কৃত গুনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ বিরত হয়ে যাওয়া।
২. কৃতকর্মের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
৩. ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর কখনও না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।
৪. কারও কোনো হক নষ্ট করে থাকলে কিংবা কারও উপর জুলম করে থাকলে সে হক ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেওয়া।
৫. তাওবার সময় বাকি থাকতে তাওবা করা। অতএব, মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে কিংবা কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করলে সে তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।

শেষ বিষয়

কৃত তাওবার উপর অটল-অবিচল থাকার উপায় ও মাধ্যমসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মাধ্যম হচ্ছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার স্থান পরিত্যাগ করা। এমনকি সেই সব সাথি-সঙ্গীদের থেকেও দূরে থাকা, যারা পুনরায় গুনাহের দিকে আহ্বান করবে কিংবা উক্ত গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি।

বিগত যুগে এক খুনী অতিবাহিত হয়েছে। সে সাধারণ কোনো খুনী ছিল না। একজন, দুইজন বা দশজনকে খুন করেনি। সে খুন করেছে নিরনব্বই জনকে। হাঁ, নিরানব্বই জন মানুষকে সে খুন করেছে!

আমি জানি না, সে মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা থেকে কীভাবে রেহাই পেয়েছিল। হতে পারে সে একজন ভয়ংকর খুনী ছিল; যার কারণে কেউ তার প্রতিবাদ করতে সাহস করত না। অথবা অন্যকোনো কারণ থাকবে হয়তো। তবে কারণ যাই হোক, বড় কথা হচ্ছে সে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছিল।

নিরানব্বই জনকে হত্যা করার পর এক সময় তার ভিতরে অনুশোচনা সৃষ্টি হল। সে তাওবা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। তাই সে তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে লাগল। লোকজন তাকে এক ব্যক্তির কথা বলল, যিনি সারাক্ষণ গির্জায় বসে উপাসনায় মগ্ন থাকেন। কখনও মুসল্লা ছেড়ে অন্যত্র গমন করেন না এবং যার সময় অতিবাহিত হয় কান্নাকাটি ও দোয়া-মুনাজাতের মধ্য দিয়ে। ওই ইবাদতকারী লোকটি ছিলেন নম্র মেজাজের; তবে তার ভিতর কিছুটা আবেগও কাজ করত।

খুনী সেই আবেদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। নিজের আগমনের কারণ বর্ণনা করে বলল, আমি নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছি। এখন আমি অনুতপ্ত। আমার কি এখন তাওবা করার কোনো সুযোগ আছে?

আমার ধারণা, কেউ কোনো পিঁপড়া মারলেও হয়তো ওই আবেদ সারা দিন শোকে-দুঃখে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিতেন। তা হলে যে ব্যক্তি নিরানব্বই জনকে খুন করেছে, তার ব্যাপারে তার জওয়াব কী হতে পারে?

কেঁপে ওঠলেন আবেদ। তার কল্পনায় ভেসে ওঠল নিহত নিরানব্বই জনের দেহ। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, না, না; তোমার মতো পাষণ্ড ও পাপীর জন্য তাওবার কোনো সুযোগ নেই। তোমার তাওবার কোনো উপায় নেই।

অল্প বিদ্যার সাধক থেকে এমন জওয়াব আশ্চর্য কিছু নয়। এমন সাধকরা আবেগপ্রবণ হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

ওই খুনী লোকটি ছিল একজন পাষণ্ড। আবেদের মুখে এই জওয়াব শুনে সে রাগে-গোস্বায় ফুঁসে ওঠল। চোখ দু'টো তার লাল টকটকে

হয়ে গেল। সে ক্ষণকাল ভাবল। তারপর খঞ্জর বের করে সাধকের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গির্জা থেকে বের হয়ে গেল।

এরপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হল। আবার অনুশোচনা জাগল খুনীর অন্তরে। আবারও সে অনুসন্ধান করতে লাগল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেমের। লোকজন তাকে একজন আলেমের সন্ধান দিল। খুনী সেই আলেমের কাছে পৌঁছল এবং তার কামরায় প্রবেশ করল। আলেমকে প্রকৃতপক্ষেই একজন সচেতন মানুষ বলে মনে হল তার কাছে। বিদ্যার প্রভাব ও জ্যোতি স্পষ্ট ছিল তার চেহারায়।

খুনী সেই আলেমের সামনে দাঁড়িয়ে একেবারেই স্বাভাবিক ভঙিতে বলল, আমি একশ' জন মানুষ খুন করেছি। এখন আমি তাওবা করতে চাইলে আমার জন্য কি তার কোনো রাস্তা আছে?

আলেম তার কথা শুনে জওয়াব দিলেন, তোমার মাঝে আর তোমার তাওবার মাঝে কে বাধা হতে পারে?

চমৎকার জওয়াব। আসলেই তো, কে তার মাঝে আর তার তাওবার মাঝে অন্তরায় হতে পারে? দুনিয়ার কোনো শক্তিই তো তার মাঝে আর তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

এই আলেম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন বিদ্যা ও শরীয়তের নিরিখে। তিনি আবেগ ও অনুরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। তবে তিনি এতটুকু বললেন– কিন্তু তুমি থাক অসভ্য অঞ্চলে।

আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি কীভাবে বুঝতে পারলেন যে, খুনী অসভ্য অঞ্চলে বসবাস করে?

তিনি বুঝতে পেরেছেন অপরাধের পরিমাণ ও প্রতিবাদের অভাব দেখে। তিনি আরও বুঝতে পেরেছন, খুনীর বসবাসের এলাকায় হত্যা, লুণ্ঠন ও জুলুম চলে অবাধে; কেউ মজলুমকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে না। তাই তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

যা হোক, ওই খুনীকে লক্ষ করে আলেম বললেন, তুমি তোমার এলাকা পরিত্যাগ করে অমুক অঞ্চলে চলে যাও। সেখানকার লোকজন

আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তুমি গিয়ে তাদের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও।

তাওবা করে মুক্তির আশায় খুনী ছুটল সেই দিকে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। অতঃপর রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা নেমে এলেন [তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য]। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, লোকটি তাওবা করে নেক জীবন যাপন করার জন্য রওয়ানা দিয়েছে। অতএব, একে আমরা নিব। অপরদিকে আযাবের ফেরেশতারা বললেন, না, তার আমলনামায় একটি নেকীও নেই। অতএব, তাকে আমরাই নিব।

তখন আল্লাহ ﷻ মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য। অবশেষে ফায়সালা এই হল যে, নেকী ও বদীর দুই শহরের দূরত্ব মাপা হবে। যে শহরের দিকে তার অবস্থান নিকটবর্তী হবে, সে ওখানকার বাসিন্দা বলে সাব্যস্ত হবে। এর মধ্যে আল্লাহ ﷻ নেকীর শহরকে হুকুম দিলেন এগিয়ে আসতে; আর বদীর শহরকে হুকুম দিলেন দূরে সরে যেতে। মাপার পর দেখা গেল, খুনী নেকীর শহরের নিকটবর্তী। ফলে রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে গেলেন।

প্রিয় পাঠক!

এ ঘটনা বলে আমার যে কথাটি বোঝানো উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে– লক্ষ করুন, আলেম খুনী লোকটিকে কী বলেছেন! বলেছেন– 'তুমি তোমার এলাকা পরিত্যাগ করে অমুক অঞ্চলে চলে যাও। সেখানকার লোকজন আল্লাহ ﷻ-র ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তুমি গিয়ে তাদের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও।'

ঠিক তদ্রূপ, যিনি যিনা-ব্যভিচার থেকে তাওবা করতে চাইবেন, তার কর্তব্য হচ্ছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার স্থান পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। এমনিভাবে যিনি সালাত না পড়া, গানবাদ্য শোনা, সুদ-ঘুষ খাওয়াসহ শিরক-বিদআত ও অন্য যেকোনো গুনাহ থেকে তাওবা করতে চাইবেন, তাদের সকলের উচিত এমন স্থান ও

সঙ্গ পরিত্যাগ করা, যা তাকে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে তাঁর যথাযথ তাকওয়া ও ভয় দান করেন, যা আমাদের মাঝে এবং আমাদের গুনাসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে; আমাদের যেন যথাযথভাবে তাঁর আনুগত্য করার তাওফীক দান করেন, যা আমাদের জান্নাত লাভের উসিলা হবে; তিনি যেন আমাদের যাবতীয় গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেন, হালালের মাধ্যমে হারাম থেকে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তিনি ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে আমাদের অমুখাপেক্ষী করে দেন; আমাদের তাওবা কবুল করেন, আমাদের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধকে ধুয়ে-মুছে পাক-সাফ করে দেন। তিনি সর্বশ্রোতা, আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

সমাপ্ত

ذِكْرَيَاتُ تَائِبٍ
بِاللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّة

আল্লাহ তাআলা বলেন– 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা যুমার : ৫৩]

'হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী-পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তা হলে আমিও তোমার কাছে পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব। [তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪০]

হাঁ, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী-পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হবেন। অতএব, আপনি–
– কী পরিমাণ গুনাহ করেছেন? – আমলনামা গুনাহে কালো করে ফেলেছেন।
– গুনাহ দিয়ে আসমান-জমিন ভরে ফেলেছেন?

হতাশ হবেন না। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। বরং হিম্মত করে এখনই ফিরে আসুন। আসমানের দুয়ারে কড়া নাড়ুন। আশা রাখুন, আসমান থেকে অবশ্যই জওয়াব পাবেন। আল্লাহর রহমতের শান দেখুন। তিনি বান্দাকে গুনাহ করতে দেখেন, অবাধ্যতা ও না-ফরমানি করতে দেখেন, কিন্তু পাকড়াও করেন না। বরং অবকাশ দেন। কিছু রোগ-শোক, বিপদ-আপদ বালা-মসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। যেন বান্দা ফিরে আসে; অবাধ্যতা ছেড়ে আনুগত্য করে। অতএব, আর দেরি কেন? – এখনই ফিরে আসুন। – যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করে ফেলুন। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।